ক্রোড়পত্র

ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব
প্রেক্ষিত
‘জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন’

২৯ এপ্রিল ২০২৩ শনিবার কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যাবের উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, সামাজিক আন্দোলন ও ভোক্তা অধিকার আন্দোলনের কর্মী এবং সংবাদকর্মীদের উপস্থিতিতে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর তোপখানা সড়কে অবস্থিত সিরডাপ-এর এটিএম শামসুল হক অডিটোরিয়ামে সকাল ১০.০০টা থেকে বেলা ২.০০টা পর্যন্ত চলে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যাবের সভাপতি জনাব গোলাম রহমান।

শুরুতেই সংস্কারের প্রস্তাবের প্রারম্ভিক উপস্থাপনা তুলে ধরেন ক্যাবের জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম শামসুল আলম। সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন ও এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক বদরুল ইমাম, অধ্যাপক এম এম আকাশ, স্থপতি ইকবাল হাবিব, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং অধ্যাপক এম শামসুল আলম। সংস্কার প্রস্তাবের ওপর রাজনীতিবিদ পর্যায়ে আলোচনা করেন রাজেকুজ্জামান রতন, রুহিন হোসেন প্রিন্স, দিলীপ বড়ুয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি। মুখ্য আলোচক ও সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন রাশেদ খান মেনন এমপি। অনুষ্ঠানে

উপস্থিত সামাজিক আন্দোলন ও ভোক্তা অধিকার আন্দোলনের কর্মী এবং সংবাদকর্মীরা সংস্কার প্রস্তাব প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখেন, মতামত ও বক্তব্য তুলে ধরেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপনকারীদের পাশাপাশি মুক্ত আলোচনা ও ভোক্তার জ্বালানি অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী দিনের পরিকল্পনার নানা দিক তুলে ধরেন আলোচকরা। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম মুলতবির ঘোষণা প্রদান করেন ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া। সভা সমন্বয় করেন ক্যাবের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান (রাজু)। অনুষ্ঠান সম্প্রচারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে ভোক্তাকণ্ঠ ডটকম।

কর্মশালায় উপস্থাপিত সংস্কার প্রস্তাব ও আগত রাজনীতিবিদদের আলোচনা এবং উপস্থিতিদের দেয়া মতামতের গুরুত্ব বিবেচনায় এই কর্মশালার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে প্রকাশ করা হলো।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

২৯ এপ্রিল, ২০২৩ সিরডাপ মিলনায়তন কেন্দ্র থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ক্যাবের সংস্কার প্রস্তাব: প্রেক্ষিত- জ্বালানি সংকট ও নবায়ানযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন। অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের ক্যাবের সভাপতি জনাব গোলাম রহমান স্যারের অনুমতি প্রার্থনা করছি। স্যারের অনুমতিক্রমে প্রথমেই জানিয়ে রাখছি, আজকের এ জনগুরুত্বপূর্ণ সভায় এ অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বরেণ্য রাজনীতিবিদ জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি, সভাপতি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি মহোদয়। এছাড়াও শহীদুজ্জামান সরকার এমপি ও শিরীন আকতার এমপি, দুজনেরই আসার কথা ছিলো। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তারা আসতে পারেননি।

এ অনুষ্ঠানে ক্যাবের সংস্কার প্রস্তাবটি উপস্থাপন করবেন সম্মিলিতভাবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বদরুল ইমাম, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ, নগর বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং বিশিষ্ট আইনজীবি জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। এবং সঙ্গে থাকবেন ক্যাবের জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম শামসুল আলম। এছাড়াও এ অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব দিলীপ বড়ুয়া। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদের সহ সাধারণ সম্পাদক জনাব রাজেকুজ্জামান রতন। এছাড়া নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অনেকেই রয়েছেন। আরও রয়েছেন সংবাদকর্মীরা, যাদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষের কাছে এ অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু পৌঁছে যাবে।

আয়োজনের প্রথমেই আমি অনুরোধ করবো জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম শামসুল আলমকে তার প্রারম্ভিক উপস্থাপনা তুলে ধরার জন্য।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম, জেষ্ঠ্য *সহ-সভাপতি, ক্যাব*

শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, আপনারা আমার সালাম নিবেন। ক্যাব প্রণীত সংস্কার প্রস্তাবের প্রারম্ভিক উপস্থাপনা এখানে তুলে ধরছি।

(১) আইএমএফ-এর ঋণের শর্ত, ভর্তুকি প্রত্যাহার হবে। ক্যাব-এর বক্তব্য, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে সম্পৃক্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও মুনাফা রোধ করা হলে ভর্তুকি লাগে না এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপও থাকে না। অথচ ভর্তুকি প্রত্যাহারে মূল্যহার বেশি বেশি, ঘন ঘন বৃদ্ধি অব্যাহত রইল। এবং মূল্যহার নির্ধারণের কাজটি বিইআরসি আইন সংশোধন করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের আমলাদের হাতে দেয়া হলো।

(২) বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে চলমান সংস্কারের উদ্দেশ্য: (১) ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য এ-খাতকে বিভাজিত করা, (২) পর্যাপ্ত মুনাফায় দেশি-বিদেশি ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ আকর্ষণের অজুহাতে এ-খাতকে বাণিজ্যিক খাতে পরিণত করা, (৩) এ-জন্য ভোক্তাস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দ্বারা অযৌক্তিক ও লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি করা, (৪) ভর্তুকি প্রত্যাহার করা ও আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ে মূল্যহার বৃদ্ধি করা, এবং (৫) প্রতিযোগিতাহীন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে বিনিয়োগকারীর জন্য এ-খাতকে লাভজনক করা।

(৩) কম-বেশি ১৮ শতাংশ মুনাফায় বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা হয়। কম-বেশি ৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি হলেও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ১২ শতাংশ। আমদানি ব্যয়বৃদ্ধিজনিত আর্থিক ঘাটতি মোকাবেলায় তেল, গ্যাস, ও বিদ্যুতের মূল্য বাড়ানো হচ্ছে।

জ্বালানির অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমানো হচ্ছে। ফলে ভোক্তারা অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির অভিঘাত এবং চরম বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের শিকার।

(৪) আইপিপি পলিসির আওতায় ব্যক্তিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। গ্যাস বণ্টনে সরকারি খাত বৈষম্যের শিকার। আমদানিকৃত গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি দ্বারা সরকার দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় নিশ্চিত করেছে। ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে উচ্চতর ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আমদানি হচ্ছে। কয়লা ও গ্যাস আমদানি চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় বিদ্যুৎ আমদানির ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার কমে আসছে। কিছু দিন আগেও ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হতো প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এখন দিতে হয় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।

(৫) ২০২২ সালে গণশুনানিতে জানা যায়, প্রতি ঘনমিটার দেশীয় কোম্পানির গ্যাস কেনা হয় ১.০৩ টাকায়। অথচ স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি/গ্যাস আমদানি হয় প্রতিঘনমিটার ৮৩ টাকায়। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নেই বললেই চলে। তহবিলের ৬৫% অর্থই অব্যবহৃত। অর্থাৎ তহবিল অকার্যকর।

(৬) প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অন্যায় এবং অযৌক্তিক ব্যয় ও মুনাফায় সরবরাহ হওয়ায় আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি গণশুনানিতে বারবারই আপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রতিটি গণশুনানিতে প্রমাণিত হয়, ব্যয় ও মুনাফা ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি বাণিজ্য লুণ্ঠনমুক্ত হতো। এবং আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে থাকতো। ফলে সরকারকে ভর্তুকি এবং ভোক্তাকে মূল্যহার বৃদ্ধির চাপে থাকতে হতো না।

(৭) ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়নের সুযোগ আসে এবং বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাত উন্নয়ন প্রাধান্য পায়। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা পিডিবি ও পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-খাতে প্রফেশনালরা ক্ষমতায়নের সুযোগ পায়। প্রফেশনালদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নই মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন। কিন্তু পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত প্রশাসন আমলাকরণের শিকার হলো। প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানি প্রশাসন আমলার নিয়ন্ত্রণে এলো। ফলে এ-সব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন বাধা পড়ে। অনিয়ম-দুর্নীতি এবং লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জনগণের বিরোধীতার কারণে কয়লা ও গ্যাস রপ্তানী রহিত হলেও জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন উপেক্ষিত হওয়ায় নিজস্ব সক্ষমতায় তা উত্তোলন করার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস আমদানির ওপর দেশ এখন অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। আমদানি ব্যয়বৃদ্ধি, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকট এবং ভর্তুকি প্রত্যাহার-এসব কারণে অব্যাহত অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে ভোক্তারা জ্বালানি সুবিচার বঞ্চিত এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীন।

(৮) দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর আওতায় প্রতিযোগীতাবিহীন উচ্চ মূল্যে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। সে-ঘাটতি দ্রুত সমন্বয়ের

জন্য বিইআরসি আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার যথাক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগই নির্ধারণ করে। তাতে জবাবদিহির পথ রুদ্ধ হয়। উক্ত আইন এবং বিইআরসি আইনের সংশোধনী উভয়ই ভোক্তাদের জ্বালানি সুবিচার থেকে বঞ্চিত এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীন হওয়ার জন্য দায়ী।

(৯) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮ মতে ২০২১ সালে বিদ্যুতের ১০ শতাংশ হতে হতো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। বাস্তবে এক শতাংশও হয়নি। সৌরবিদ্যুৎ এখন ১০ টাকা ব্যয়হারেই উৎপাদন সম্ভব। অথচ আমদানিকৃত কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয়হার গড়ে ১৭-১৮ টাকা। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় আরো বেশি। বিদ্যুৎ ওলিগোপলির শিকার না হলে বিদ্যুৎ ও ডলার সংকট সমাধানে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ হতো গুরুত্বপূর্ণ।

(১০) ইউএসএআইডি-এর অনুশীলন মতে গ্রিডে সংযোগযোগ্য সম্ভাব্য সৌর-পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট। জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণাগারের উইন্ড ম্যাপিং-এর তথ্য মতে বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয়চুক্তি মতে, সৌর-বিদ্যুতের মূল্যহার ৯.৯৯ ইউএস সেন্টস (১ ডলার = ১০৫ টাকা)। ২০২০ সালের ক্রয়চুক্তি মতে বায়ু-বিদ্যুতের মূল্যহার ছিল ১৩.২০ টাকা। ভারতে এখন উভয় বিদ্যুতের মূল্যহার কম-বেশি ৩ রুপি (১ ডলার = ৮৫ রুপি)। ভারতের পরিকল্পনায় ২০৩০ সালে সৌর-বিদ্যুতের মূল্যহার হবে ১.৯-২.৬ রুপি, এবং বায়ু-বিদ্যুতের মূল্যহার ২.৩-২.৬ রুপি। কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ব্যয় ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মূল্যহার ভারতের মতো হতো।

(১১) পরিকল্পনায় বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ এখনও ১০ শতাংশে আটকে আছে। ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা সংশোধনীতে ধরা হয় ২০২০, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের প্রতি ক্ষেত্রেই নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ১০ শতাংশ। সকল মহাপরিকল্পনায় নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থবির রেখে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা বাড়াতে বলা হয়েছে। কারণ, লক্ষ্যঃ বিদ্যুৎ ও জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি বাজার উন্নয়ন। এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য টেকসই 'ক্লিন এনার্জি' নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্যঃ (১) সবার জন্য বিদ্যুৎ এবং (২) ২০৩০ সালে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মাত্র ১০ শতাংশ।

(১২) প্রতিবছর জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন করে। ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপি জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সে লক্ষ্যে, দেশে দেশে জ্বালানি সংরক্ষন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবহণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। প্রথাগত জ্বালানিতন্ত্র (Energy System) দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে কার্বণমুক্ত নতুন জ্বালানিতন্ত্র। এ জ্বালানিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি খাতে সুশাসন এবং সমতাভিত্তিক জ্বালানি বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তাতে বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সুযোগে জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে জাতীয় সক্ষমতা অর্জনই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। সে-লক্ষ্যে ক্যাব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কার প্রস্তাব করেছে। সে-সব প্রস্তাব সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সভায় এখন উপস্থাপিত হবে।

পূর্ণাঙ্গ সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন: ক্যাব সংস্কার প্রস্তাব-এর পূর্ণাঙ্গ লিখিত রূপ সেমিনারে উপস্থিত সকলের হাতে হাতে সরবরাহ করা হয়েছে। এখন তার বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব: জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে চলমান সংস্কার/রূপান্তর দৃশ্যমান হয় ৯০ দশকে। উন্নয়ন সহযোগী বিদেশি সংস্থাদের পরামর্শে সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হয়। তারা ব্যাংকের মতই সুদে ঋণ দেয়। ঋণের মূলত উদ্দেশ্য, দেশে দেশে বিভিন্ন খাতে বিদেশি বিনিয়োগের বাজার সৃষ্টি করা। সে-জন্য তারা প্রায়শই আমাদের মতো স্বল্প উন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন পলিসি নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার প্রভাবিত হয়। জনস্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও এ-কাজে বিশিষ্ট আমলাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে।

ওইসব সংস্থার ঋণ বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী। আইএমএফ-এর ঋণের শর্ত, ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে। ক্যাব-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে সম্পৃক্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও মুনাফা রোধ করা হলে বিদ্যমান ভর্তুকি সমন্বয় হয় এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপ থাকে না। আমলা নির্ভর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রশাসন আইএমএফ-এর শর্ত অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধিতে তৎপর। এ-কাজ যেন সহজে হয়, সে-জন্য সরকার মূল্যহার নির্ধারণের কাজটি বিইআরসি আইন সংশোধন করে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বিইআরসি'কে ওই উভয় বিভাগের অধিদপ্তর বলা যায়।

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে চলমান সংস্কারের মূল উদ্দশ্য ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ উপেক্ষা করে বাণিজ্যিক বিবেচনায়– (১) ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে বান্ডেল মুক্ত করা, (২) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে রাষ্ট্রের কৌশলগত এ খাতকে বাণিজ্যিক খাতে পরিণত করা, (৩) ভোক্তাস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দ্বারা অযৌক্তিক ও লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা, (৪) ভর্তুকি প্রত্যাহার করা ও আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি করা, এবং (৫) কম-বেশি ১৮ শতাংশ মুনাফায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিগত এক দশকে গড়ে বছরে কম-বেশি ৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি হলেও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় গড়ে ১২ শতাংশ। যার ৫০ শতাংশেরও বেশি এখন অব্যবহৃত। ফলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছে। জ্বালানি তেল ও এলএনজি আমদানি ব্যয়বৃদ্ধিতে আর্থিক ঘাটতি মোকাবেলায় ভর্তুকিসহ কয়লা, গ্যাস, জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের মূল্যহার বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি আবার প্রাথমিক জ্বালানি আমদানির পরিমানও কমানো হয়। ফলে ভোক্তারা একদিকে মূল্যবৃদ্ধির অভিঘাত এবং অন্যদিকে চরম বিদ্যুৎ ও প্রথমিক জ্বালানি সংকটের শিকার।

আওতায় ব্যক্তিখাতকে সে সুযোগ দেয়া হয়। গ্যাস বণ্টনেও সরকারি খাত বৈষম্যের শিকার। সরকার যৌথ মালিকানায় আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ মূল্যের বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল গ্রহনের পরিবর্তে উচচতর ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আমদানি হচ্ছে। আবার কয়লা আমদানি চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় বিদ্যুৎ আমদানির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। অভিযোগ রয়েছে কিছু দিন আগেও বিদ্যুৎ আমদানি ও উৎপাদনে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হতো প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি। এখন দিতে হয় ৪ হাজার কোটি টাকা। আগামীতে এ-বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

২০২২ সালে গণশুনানিতে জানা

মূল্যহার বৃদ্ধি ও প্রতিযোতিাহীন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে বিনিয়োগকারীর জন্য এ-খাতকে লাভজনক খাতে পরিণত করা। সরকার বিনিয়োগ থেকে সরে আসছে। ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ বাড়ছে। কোম্পানি আইন ১৯৯২ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/কোম্পানিসমূহ পর্যাপ্ত মুনাফায় বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

গণশুনানিতে জানা যায়, চাহিদা স্বল্পতার কারণে ভোলার মজুদ গ্যাস অনেকটাই অব্যবহৃত। অথচ চাহিদা মাফিক গ্যাস না পাওয়ায় সেখানে পিডিবি'র কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্লান্টের উৎপাদনক্ষমতা আংশিক ব্যবহার হয়। আবার বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে অর্থ থাকা সত্ত্বেও সরকারি খাত তথা পিডিবি গ্যাসভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মানের সুযোগ পায়না। বরং আইপিপি পলিসির

যায়, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। অর্থাৎ তারা প্রিডেটরি মুনাফা করার সুযোগ পাচ্ছে। অপর দিকে প্রতি ঘন মিটার দেশীয় কোম্পানির গ্যাস কেনা হয় ১.০৩ টাকায়। অথচ স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি হিসেবে গ্যাস আমদানি করা হয় ৮৩ টাকা মূল্যহারে। এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন চার্জই দিতে হয় ২.১৭

টাকা। অথচ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে দেশীয় কোম্পানির গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নেই বললেই চলে। তহবিলের ৬৫% অর্থই অব্যবহৃত। এসব তথ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় জ্বালানি সম্পদ মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে গ্যাস (এলএনজি) ও কয়লা আমদানি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ ব্যয় এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে।

প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয় ও মুনাফায় সরবরাহ করা হয়। ফলে আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি গণশুনানিতে বারবার আপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রতিটি গণশুনানিতে তথ্য-প্রমাণাদি দ্বারা ভোক্তা পক্ষ দেখায়, ব্যয় ও মুনাফা ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি বাণিজ্য লুণ্ঠনমুক্ত হয় এবং আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে সরকার ভর্তুকি এবং ভোক্তা মূল্যহার বৃদ্ধির চাপে থাকবে না।

কোনো দেশের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য দেশটির স্বাধীনতা থাকতে হয়। পরাধীনতায় জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ ঘটে না। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি বা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরকারের নিকট বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বিপিডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি জ্বালানি খাত উন্নয়নে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সচিবের পদমর্যাদায় একজন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে এ-সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয়। অর্থাৎ এনার্জি খাতে প্রফেশনালদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রফেশনালদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নই মুলত এ-খাতের উন্নয়ন। এখানেই বিপত্তি।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। তখন প্রতিটি দেশই নিজস্ব জ্বালানি উৎসের অনুসন্ধানে নামে। আমরাও নিজস্ব উৎস থেকে বিদেশি বিনিয়োগে প্রোডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট (পিএসসি)-এর আওতায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে উদ্যোগ নেই। কিন্তু দেখা গেল, যে পরিমাণ তেল-গ্যাস উত্তোলন হবে, তার বেশির ভাগই বিদেশি কোম্পানি পাবে। তাই তখন ভাবা হলো, নিজস্ব সক্ষমতায় উত্তোলন করা হলে শতভাগ তেল-গ্যাস আমরাই পাব। কিন্তু পরবর্তীতে এই ভাবনা কাজে আসেনি। আমলাকরণের শিকার হওয়ায় জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন আর আলোর মুখ দেখেনি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বিশেষ মহল বলে থাকে সাগরে তো নয়ই, স্থলেও বাপেক্স গ্যাস অনুসন্ধানে সক্ষম নয়।

বাস্তবে ইতিমধ্যেই বাপেক্স ভূখন্ডে গ্যাস আবিস্কার সক্ষমতা যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে। দেশের ভূখন্ড একাধিক অংশ অতি সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও (যেমন, চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম) সেখানে অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহন করতে দেখা যায়না। অতি সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক ভূখন্ডে ৪৬টি অনুসন্ধান, মূল্যায়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ খননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে অতি বিলম্বে। এ কারণে বর্তমান গ্যাস সংকট কাটাতে তার ভূমিকা অনিশ্চিত। এ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন পাঁচ বছর আগে নেওয়া হলে হয়তো বর্তমানে তার সুফল পাওয়া যেতো। তদুপরি এই কার্যক্রমটির ভাগ্য নিকট অতীতে গৃহীত ১০৮টি কূপ খনন পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও পরিত্যাগ করার মতো হবে কিনা এ আশংকা থেকেই যায়। একইভাবে দেশের সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধানে গত দশ বছরের স্থবিরতা এখান থেকে গ্যাস আহরণের সম্ভাবনাকে দূরবর্তী ভবিষ্যতে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে সাগরবক্ষে বিদেশি কোম্পানিকে নিয়োজিত করে গ্যাস অনুসন্ধান করার জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তার ধীর গতি আশু সুফল দিতে সক্ষম হবে না। ইতিপূর্বে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার ও ভারত উভয় দেশই এই একই সাগরে বড় গ্যাস প্রাপ্তির সাফল্য দেখালেও বাংলাদেশ সেই সাগরের গ্যাস অনুসন্ধানে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। তার পরিবর্তে বিদেশ থেকে উচ্চ মূল্যে এলএনজির আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে জ্বালানি সরবরাহকে অতি ব্যয়বহুল করে তোলা হয়েছে।

পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত প্রশাসন আমলাকরণের শিকার হলো। প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানি প্রশাসন কোনো না কোনোভাবে আমলা নিয়ন্ত্রণে আসে। এ-ভাবে কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন অসম্ভব। ফলে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জনগণের বিরোধীতার কারণে কয়লা ও গ্যাস রপ্তানী রহিত হলেও জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন উপেক্ষিত হওয়ায় নিজস্ব সক্ষমতায় তা উত্তোলন করার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস আমদানির ওপর দেশ এখন অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। এমতাবস্থায়, একদিকে আমদানি ব্যয়বৃদ্ধি, অন্যদিকে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকট এবং ভর্তুকি প্রত্যাহার- এসব কারণে ভোক্তা পর্যায়ে অব্যাহত অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে ভোক্তারা একদিকে জ্বালানি সুবিচার (এনার্জি জাস্টিস) বঞ্চিত, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তাহীন।

ওই-সব বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে ঘাটতি সমন্বয়ে শুধু ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি বিগত দুই দশক ধরে অব্যাহত আছে। দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর বেপরোয়া ব্যবহার হওয়ায় প্রতিযোগীতাবিহীন উচ্চ মূল্যে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে দীর্ঘমেয়াদে সরবরাহ ব্যয় অযৌক্তিক বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। সেই অব্যাহত আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি দ্রুত সমন্বয়ের জন্য বিইআরসি আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বিইআরসি'র পরিবর্তে যথাক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগ এখন গণশুনানি ছাড়াই নির্ধারণ করে। তাতে জবাবদিহির পথ রুদ্ধ হয়। ওই আইন এবং বিইআরসি আইনের সংশোধন এই উভয়ই ভোক্তাদের জ্বালানি সুবিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তাহানীর জন্য মূলত দায়ী।

আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ

রয়েছে, বিশেষ করে সৌরশক্তি থেকে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮ মতে ২০২১ সালে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ হতে হতো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। কিন্তু বাস্তবে তা এক শতাংশও নয়। প্রতি ইউনিট সৌর বিদ্যুৎ অনধিক ১০ টাকা ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব। তাতে পর্যাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও মুদ্রা সাশ্রয় হতো। অথচ তা না করে আমদানিকৃত কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয় হয় গড়ে ইউনিট প্রতি ১৭-১৮ টাকা। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় আরো বেশি। বিদ্যুৎ বাজার এমন অসমতার শিকার না হলে বিদ্যুৎ ও ডলার সংকট সমাধানে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ হতো অন্যতম অবলম্বন।

ইউএসএআইডি-এর অনুশীলনে দেখা যায়, গ্রিডে সংযোগযোগ্য সম্ভাব্য সৌর-পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট এবং জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণাগারের উইন্ড ম্যাপিং-এর সূত্রে পাওয়া তথ্য মতে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৮০ হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের সৌর বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে দেখা যায়, সৌর বিদ্যুতের মূল্যহার ৯.৯৯ ইউএস সেন্টস (১ ডলার = ১০৫ টাকা)। ২০২০ সালের ক্রয়চুক্তি মতে বায়ু বিদ্যুতের মূল্যহার ছিল ১৩.২০ টাকা। ভারতে এখন উভয় বিদ্যুতের মূল্যহার কম-বেশি ৩ রুপি (১ ডলার = ৮৫ রুপি)। ভারতের পরিকল্পনায় ২০৩০ সালে সৌর বিদ্যুতের মূল্যহার হবে ১.৯-২.৬ রুপি, এবং বায়ু বিদ্যুতের মূলহার হবে ২.৩-২.৬ রুপি। কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ব্যয় ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মূল্যহার ভারতের পর্যায়ে নামিয়ে আনা অসম্ভব নয়।

পরিকল্পনায় বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এখনও অফ ট্র্যাকেই রয়েছে। অর্থাৎ ১০ শতাংশের বেড়াজালে আটকে আছে। ২০০৮ সালের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি অনুযায়ী ২০২১ সালে মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ হতে হতো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। তা মোটেও হয়নি। ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা সংশোধন করা হয়। তাতে ধরা হয় ২০২০, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালে প্রতি ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ। জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে কখনই নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। বরং সকল মহাপরিকল্পনায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি ও জীবাশ্ম জ্বালানির বাজার সম্প্রসারণ করে এবং নিজস্ব জ্বালানির মজুদ ও উত্তোলন বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থবির রেখে জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানি নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। তার কারণ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি বাজার উন্নয়ন। সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তদুপরি, এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য টেকসই 'ক্লিন এনার্জি' নিশ্চিত হবে। কিন্তু তা হবার নয়। কারণ আমাদের লক্ষ্য: (১) বিদ্যুতে সবার অ্যাকসেস এবং (২) ২০৩০ সালে মোট বিদ্যুতের মাত্র ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ।

প্রতিবছর জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন করে। ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপি জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সে লক্ষ্যে, দেশে দেশে জ্বালানি রূপান্তরে (Energy Transition) জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবহন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। ২০২১ সাল নাগাদ গড়ে বিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। অবশ্য জার্মানিতে ২০ শতাংশ। সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত ও চীনের অগ্রগতি সন্তোষজনক। রূপান্তরের গতি

ও প্রকৃতি অনুধানে বুঝা যায়, প্রথাগত জ্বালানিতন্ত্র (Energy System) দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে কার্বনমুক্ত নতুন জ্বালানিতন্ত্র। এ জ্বালানিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি খাতে সুশাসন এবং সমতাভিত্তিক জ্বালানি বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তাতে বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সে সুযোগে জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে জাতীয় সক্ষমতা অর্জনই এখন আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। এই বিবেচনায় ক্যাবের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংস্কার/রূপান্তর প্রস্তাব করা হলো:

ক. মালিকানা/স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ কৌশল

প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ মতে ভূ ও সমুদ্র গর্ভের জ্বালানি সম্পদের মালিক জনগণ বিধায় এ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানার অধিকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

১৩ অনুচ্ছেদ মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন যন্ত্র এবং উৎপাদিত পণ্য বণ্টন ও বিতরণের মালিক বা নিয়ন্ত্রক জনগণ বিধায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্য যথা সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির ওপর জনগণের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বিধি-বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

১৬ অনুচ্ছেদ মতে শহর ও পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে ভোল্টেজ লেভেল ও ভোক্তা শ্রেণীভেদে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বণ্টন ও বিতরণ এবং মূল্যহার নির্ধারণে বিধি-বিধান দ্বারা সমতা নিশ্চিত হতে হবে।

১৮(১) অনুচ্ছেদ মতে বর্তমান ও ভবিষৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ক্রমাগত নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা প্রতিস্থাপন পলিসি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

প্রান্তিক ভোক্তা শ্রেণীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ওপর স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ বিধি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

খ. ন্যায্যতা, সমতা ও স্বচ্ছতা উন্নয়ন কৌশল

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ও বণ্টনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি ইউটিলিটির কার্যক্রমে ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জ্বালানি সুবিচার (এনার্জি জাস্টিস) নিশ্চিত হতে হবে।

ভোক্তা যেন সঠিক দাম, মাপ ও মানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য মূল্যহার নির্ধারণ, উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, সমতা, যৌক্তিকতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হতে হবে।

গ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা বিশেষ করে অনুপাদনশীল খাতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি কমানো এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা কমিয়ে আনতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ আমদানি বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সরকারি বা বেসরকারি মালিকানাধীন মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য স্থির ব্যয় (Fixed cost/capacity charge) বহির্ভূত (excluded) হতে হবে এবং মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক গণশুনানির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে।

দেশি-বিদেশি এবং সরকারি-বেসরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে বৈষম্য নিরসন হতে হবে।

সকল সেবা ও পণ্য উৎপাদনে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ক্যাপটিভ/বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রয়োজনে প্রণোদনার বিনিময়ে নিশ্চিত হতে হবে।

রপ্তানিমুখী বিদেশি মালিকানাধীন সার ও সিমেন্ট কারখানায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্যিক মূল্যহারে নিশ্চিত হতে হবে।

স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় পরিবহনে জ্বালানি হিসেবে তেল, সিএনজি ও এলপিজির স্থলে বিদ্যুতের

> **‘আমাদের রাজনীতিতে এই ‘ইনডেমনিটি’ নিয়ে এত কথা হয়েছে, এটা একটা ঘৃণিত শব্দ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু দেখা গেলো বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এসে আমরা অবলীলায় এ আইনটি তৈরি করে দিলাম। যে আইনের অধীনে উৎপাদন, বিতরণ, ব্যবহার ও তার সব ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করতে পারবে না। সেটা সর্বশেষ ২০২২-এ এসে আবার নতুন করে সংশোধন করে নবায়ন করা হয়’**
>
> **রাশেদ খান মেনন**, সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি নিশ্চিত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় শতভাগ বিদ্যুতের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা, মটর-সাইকেল– এমন সব হালকা পরিবহনে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় চাষে ডিজেলের পরিবর্তে এবং সেচে ডিজেল ও গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ অলাভজনক এমন অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায় সেখানে শতভাগ অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

হবে।

মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় প্রথাগত বায়োমাস জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে বায়োমাস-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে।

ন্যূনতম ব্যয়ে এবং সর্বোচ্চ দক্ষতায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা হতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় চলমান জ্বালানি রূপান্তর প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং জ্বালানি বিপ্লব বিকাশ হতে হবে।

ঘ. স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে

মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুতে ব্যাটারি/আইপিএস চার্জ শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

ক্রমাগত পৌর এলাকায় স্ট্রিট লাইটিং-এ সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি হতে হবে।

প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় কয়লা ও জ্বালানি তেলের অনুপাত কমাতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ বৃদ্ধি দ্বারা জ্বালানি আমদানি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হতে

স্থানীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সক্ষমতা অর্জন উদ্যোগে আর্থিক অনুদান ও প্রণোদনা থাকতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পাইকারি ক্রয় মূল্যহার নির্ধারণে স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন এবং তার বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রণোদনার সুযোগ থাকতে হবে।

মন্ত্রনালয়ে পৃথক নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

ঙ. মূল্যহার নির্ধারণ কৌশল

ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের লাইসেন্সিদের চার্জহার এবং সরকারের রাজস্ব আহরণ ন্যায্য ও যৌক্তিক হতে হবে। সে-জন্য মূল্যহার নির্ধারণ প্রবিধানমালাসমূহ সংশোধন হতে হবে।

সরকারি ও ব্যক্তিখাত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পাইকারি মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি হতে হবে।

মূল্যহার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান (এসি ব্যতীত) এবং প্রান্তিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্যহার নির্ধারিত কৌশল সংশোধন হতে হবে।

বাণিজ্য ও শিল্প কারখানার মূল্যহার কস্টপ্লাস হতে হবে। তবে তাদের ক্ষেত্রে যে-সব আর্থিক প্রণোদনা রয়েছে, সে-সব প্রণোদনা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রযোজ্য প্রণোদনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দেশি শিল্প ও রপ্তানিমুখী বিদেশি শিল্পে মধ্যে গ্যাসের বণ্টন ও মূল্যহারে বিদ্যমান অসমতা নিরসন হতে হবে।

১১-২৩০ কেভি লেভেলের বাণিজ্যিক এবং এসি আবাসিক গ্রাহকসহ বিভিন্ন বিনোদন এবং বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার ভর্তুকিমুক্ত-কস্ট প্লাস হতে হবে।

গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্যহার পৃথক হতে হবে। প্রান্তিক ভোক্তার ক্ষেত্রে রান্নায় ব্যবহৃত এলপিজি ও পাইপলাইন গ্যাসের মূল্যহার প্রান্তিক বিদ্যুৎ ভোক্তার মূল্যহারের অনুরূপ হতে হবে।

চ. জ্বালানি রূপান্তর কৌশল

ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও প্যারিস চুক্তি সঙ্গে চলমান জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রমের অসংগতিসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং তার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে হবে।

এনার্জি সাপ্লাইসহ আবাসিক,

বাণিজ্যিক, কৃষি, শিল্প ও পরিবহনে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হতে হবে।

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতের ইউলিটিসমূহে বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি এবং মুনাফার মার্জিন দক্ষতা ও সক্ষমতাভিত্তিক হতে হবে।

জ্বালানি আমদানি, অনুসন্ধান, উৎপাদন ও সরবরাহ জনগণের শতভাগ মালিকানায় হতে হবে।

পিপিপি পলিসি'র আওতায় বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি উন্নয়ন রহিত হতে হবে।

সরকারি মালিকানাধীন এনার্জি ইউটিলিটিসমূহের শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ হতে হবে। এদের মালিকানা শতভাগ জনগণের হতে হবে।

সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড-এ পরিণত করাতে হবে। সে-জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ রদ হতে হবে।

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সেবা মানসম্মত ও স্বার্থসংঘাত মুক্ত হতে হবে। সে-জন্য এ-খাতে সরকারি ও যৌথ মালিকানাধীন সকল কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের সকল আমালাদের অবমুক্ত হতে হবে।

ছ. রেগুলেটরি ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল

কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নিউক্লিয়ার এনার্জি ও বায়োমাস এনার্জি বিইআরসি আইনে বর্ণিত এনার্জির সংজ্ঞাভুক্ত হতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমদানি বিইআরসি আইনের আওতায় বিইআরসি'র নিয়ন্ত্রণে হতে হবে।

রেগুলেটরি ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে।

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের লাইসেন্সীরাও বিইআরসি'র আওতাধীন। ফলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে ওলিগোপলি প্রতিরোধে বেসরকারি লাইসেন্সীদেরও বিইআরসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হবে। এ-ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কমিশনকেও আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে।

নিজস্ব পেশাদার কারিগরি জনবল দ্বারা স্বাধীনভাবে উভয় খাতের কোম্পানি/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত হতে হবে। সে-জন্য আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসাবে মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারি ও লাইসেন্সীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে বিইআরসি'র স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিইআরসি আইনের সংশোধনি বাতিল করে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালনির সকল পর্যায়ের মূল্যহার/চার্জহার নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বিইআরসিকে একক ক্ষমতা দিতে হবে।

জ. বিনিয়োগ উন্নয়ন কৌশল

সরকারী মালিকানায় মুনাফা ব্যতিত কস্ট বেসিসে ৫০% এর অধিক বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন হতে হবে। সরকার কস্ট প্লাস নয়, সরকার শুধু কস্ট বেসিসে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা দেবে। এ-খাত উন্নয়নে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ এবং সম্পৃক্ততা উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে, তবে মালিকানার বিনিময়ে নয়।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ জ্বালানি অনুসন্ধান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন ও আমদানিতে ভোক্তার ইকুইটি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হতে হবে এবং প্রাপ্ত মুনাফা রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় হতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন/অনুসন্ধান,

> "সরকার সারাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এটা খুব ভালো কথা। এর জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এটা কি বাণিজ্যিক কর্মসূচি? এটা তো বাণিজ্যিক কর্মসূচি হতে পারে না। বিদ্যুৎ খাতে কস্ট সাবসিডি আছে। যারা বেশি ব্যবহার করে তারা বেশি মূল্য দেয় আর যারা খুব দরিদ্র মানুষ, একেবারেই সীমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাদের জন্য বোধহয় লাইফলাইন ট্যারিফ রয়েছে। সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে। সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য যে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যয় সব ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? সব ভর্তুকি ব্যবহারকারীদেরই দিতে হবে, এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? এই বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের ভেবে দেখা উচিত। যদি ব্যয় হয়ে থাকে, সেটা কেন হচ্ছে? খুঁজে দেখা উচিত"
>
> গোলাম রহমান, *সভাপতি, ক্যাব*

সঞ্চালন/পরিবহন এবং বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্ব-স্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ও অসমতাসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং তা যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রকার ও প্রকৃতি পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে।

স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দেশীয় কোম্পানি দ্বারা করানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও টেকনোলজি ট্রান্সফার এর স্বার্থে বৃহৎ ও দক্ষ বিদেশি কোম্পানিকে ভূখন্ডে নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে জাতীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে বাপেক্স কর্মীদের অংশ গ্রহন ও ক্ষমতায়ন বাধ্যতামূলক হতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ, সার, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদনে জ্বালানি বণ্টনের অনুপাত এবং বিনিয়োগ ব্যয় স্বীকৃত পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে সরকারি ও ব্যক্তি খাত বিনিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধিতে সামঞ্জস্যতা ও সমতা বিধি/বিধান দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

কার্বণ নিঃসরণ ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক জ্বালানিসমূহ সরবরাহে উৎসভিত্তিক অনুপাত নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ হতে হবে ।

প্রতিযোগিতাবিহীন কোনো ধরনের বিনিয়োগে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়ন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হতে হবে।

পিএসসি'র আওতায় তেল-গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর ভাগের সমুদয় তেল/গ্যাস এক ক্রেতা হিসেবে সরকারের জন্য ক্রয় করা বিধি-দ্বারা বাধ্যতামূলক হতে হবে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে মডেল পিএসসিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাদি পিএসসি'র আওতায় তেল-গ্যাস উত্তোলনে অন্যান্য সফল দেশের অনুরূপ হতে হবে।

ঝ. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় তিনটি (বাপেক্স, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড লি. ও সিলেট গ্যাস ফিল্ড লি.) কোম্পানি একীভূত হয়ে একটি জাতীয় কোম্পানি গঠিত হতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে পেট্রোবাংলা/বিপিডিবির অনুরূপ স্রেডাকে স্ব-শাসিত সংস্থায় পরিণত হতে হবে। এ-খাত উন্নয়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি খাত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সক্ষম উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ প্রবিধান দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বিভাজন করে সরকারি মালিকানাধীনে বিপিডিবি'র আওতায় পেশাদারী সকল ইউটিলিটি কোম্পানি পূণর্গঠিত হতে হবে। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন পেশাদারী সকল ইউটিলিটি কোম্পানিও অনুরূপভাবে পুনর্গঠিত হতে হবে।

জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, ও বিদ্যুৎখাতের সরকারি ও যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের স্ব-স্ব পরিচালনা বোর্ড আমলামুক্ত হবে।

ভোক্তাদের অর্থে গঠিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে এবং বিইআরসির আওতায় রেগুলেটরি ব্যবস্থায় পক্ষগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তহবিলের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

সাগরের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ উন্নয়নে দেশীয় কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণ এবং স্ব-ক্ষমতা উন্নয়ন বিধিবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত হতে হবে।

সরকার ব্যক্তিখাতের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় কোনোভাবেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির শেয়ার ব্যাক্তি খাতে হস্তান্তর করবে না, আইন দ্বারা তা নিশ্চিত হতে হবে।

> **'যতগুলো প্রতিষ্ঠান সরকার তৈরি করেছিলো, সেগুলোকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করেছে। আর এগুলোর বিরুদ্ধে যাতে কেউ আন্দোলন সংগ্রাম না করতে পারে, সেজন্য ইনডেমনিটি আইন তৈরি করে রেখেছে। এখানে যার মালিক হবার কথা ছিলো সে মালিক হতে চাচ্ছে না। আর যার মালিক হওয়ার কথা নয়, তাকে মালিক বানানোর জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে'**
>
> **অধ্যাপক এম এম আকাশ**
>
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে 'মূল্য স্থিতিশীল তহবিল' গঠিত হতে হবে।

বিআরইবি ও পিডিবি উভয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের আরো বেশি প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকতে হবে। পিবিএস ও বিআরইবি প্রশাসন আরো বেশি সমতাভিত্তিক হতে হবে।

ঞ. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল

জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহারে জ্বালানি সাশ্রয়ী কৌশলসমূহ আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হতে হবে।

জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আইন ও

প্রয়োজনে প্রণোদনা দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আর্থিক প্রণোদনাসহ গৃহীত নানাবিধ কৌশল আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে।

এ খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কারিগরি জনবল নিয়মিত তৈরি হতে হবে।

ট. মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কারিগরি দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দক্ষতা মূল্যায়ণের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

ভোক্তা, ইউটিলিটি, রেগুলেটর, পলিসি ও পরিকল্পনা পর্যায়ে বিদ্যুৎ, প্রাথমিক জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপরে নিয়মিত গবেষণা ও অনুশীলন হতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্বালানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ইপিআরসি, পাওয়ার সেল, বিইআরসি, প্রতিযোগিতা কমিশন, বিএসটিআই, হাইড্রোকার্বন, পেট্রোলিয়াম ইন্সিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে। সমন্বয়ের কাজে ক্যাব সহায়ক হতে পারে।

প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে বিদেশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষকের দ্বারা দেশীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট/কেন্দ্রসমূহকে সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন এমন হতে হবে, যেন এ-সব প্রতিষ্ঠান ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সে জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

এ-সব প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনো কোনো ব্যবহারিক কোর্সের জন্য আউট-সোর্সিং হিসেবেও ব্যবহার হতে হবে।

জনস্বার্থে দেশের বিপুলসংখ্যক জনসম্পদ খাতভিত্তিতে দক্ষ ও উপযুক্ত হতে হবে এবং শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

সকল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে জ্বালানি ও পরিবেশ অধিকার সংরক্ষণ এবং জ্বালানি সুবিচারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখতে হবে।

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ অধিকার ও জ্বালানি সুবিচার বিষয়ক কোর্স ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উক্ত বিষয়ভিত্তিক একটি সার্বজনীন কোর্স চালু হতে হবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম এমন হতে হবে, যেন তা প্রস্তাবিত এই সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঠ. নীতি ও পরিকল্পনা উন্নয়ন কৌশল

আলোচ্য সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান নীতি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, পাঁচশালা পরিকল্পনাসমূহের অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত হতে হবে এবং তা সংস্কার প্রস্তাবসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় কৃষির অনুরূপ বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতেও সরকারি বিনিয়োগ মুখ্য হতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি ও কৌশল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি ও কৌশলের অনুরূপ হতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন বাজেটে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বাজেট অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাজেটে বরাদ্দও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তিন মাস অন্তর অন্তর ভোক্তা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হতে হবে। পক্ষগণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত জ্বালানি টাস্কফোর্স বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত পরিকল্পনা

কমিশনসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষগণকে দিতে হবে।

ক্যাব প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচীর সঙ্গে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সকল আইন, বিধি-বিধান এবং নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

ড. পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ উন্নয়ন কৌশল

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ বলবৎযোগ্য আইন দ্বার নিশ্চিত হতে হবে।

সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্র জীবন রক্ষার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত উন্নয়নে পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির কারণে সে অধিকার যেন খর্ব/ক্ষুণ্ন না হয়, সে-জন্য এনার্জি জাস্টিস নিশ্চিত হতে হবে।

১৮(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, তা নাগরিকের অধিকার হিসেবে আইন দ্বারা বলবৎ করতে হবে। সেই সঙ্গে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

কার্বনমুক্ত অর্থনীতি ও ভোক্তার জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম গ্রিন সোসাইটি বিনির্মাণে ভোক্তাদের স্ব-ক্ষমতা উন্নয়ন হতে হবে। এ প্রশ্নে আইন, বাণিজ্য, ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্যমূলক সুবিধাজনক কৌশলগত সম্পর্ক তৈরির কাজে ক্যাবকে সক্ষম করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত পরিচালনায় নির্গত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রশমন করার ব্যাপারে নীতি ও আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানামূখী ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্থদের বিবরণ সমৃদ্ধ ডাটাবেজ থাকতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ হতে হবে।

জলবায়ু তহবিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎস থেকে উক্ত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ঋণ নয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি/আদায় নিশ্চিত হতে হবে এবং সে ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

> **এ সরকার বঙ্গবন্ধুর নীতির কথা বলে। কিন্তু গ্যাস এর ক্ষেত্রে, জ্বালানির ক্ষেত্রে তারা বঙ্গবন্ধুর নীতির ব্যাপারে পুরোপুরি উদাস। তার চিন্তা চেতনার পরিপন্থী কাজ করছে**
>
> **জনাব দিলীপ বড়ুয়া**
>
> *সাবেক শিল্পমন্ত্রী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল*

পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে যেসব অর্থায়ন হয়, সেসব কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন নিশ্চিত হতে হবে। তার ফলাফল যেন ভোক্তার জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তা নিশ্চিত হতে হবে।

ঢ. আইনি ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত পরিচালনা ও উন্নয়নে এ যাবৎকাল যেসব নীতি, আইন, বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে, সে-সব এই সংস্কার প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে সম্পাদিত চুক্তি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত মডেল চুক্তি থাকতে হবে এবং সে মডেল চুক্তি মতে চুক্তি হতে হবে।

১৯৯০ সাল থেকে এ-যাবৎ এখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যত সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সে-সব জনস্বার্থ বিরোধী এবং জ্বালানি সুবিচারে পরিপন্থী কি-না তা খতিয়ে দেখে সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

ইতোমধ্যে (ক) বাপেক্স ও সান্তোষের মধ্যে মগনামা-২ অনুসন্ধান কূপ খননে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তি, (খ) বিআরইবি ও সামিট পাওয়ারের মধ্যে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি, এবং বিপিডিবি ও সামিট পাওয়ারের মধ্যে সম্পাদিত মেঘনাঘাট পাওয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি বেআইনি এবং জনস্বার্থ বিরোধী ও জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থী হওয়ায় এ-সব চুক্তি রদ করতে হবে।

ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থী হওয়ায় (ক) দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ রদ হতে হবে, এবং (খ) বাংলাদেশ রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন ২০০৩ এর ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৩) সংশোধনক্রমে ধারা ৩৪ক সংযোজন করায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের কাজ এখন যথাক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগ করছে। অতএব উক্ত আইনে সংযোজিত ধারা ৩৪(ক) রদ করে উক্ত মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'কে ফিরিয়ে দিতে হবে।

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ মতে প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ তথা ভোক্তা সাধারণ এবং জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে দেশের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ফলে ভোক্তাপক্ষের উপস্থাপিত উল্লিখিত রূপান্তর/সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী চলমান জ্বালানি রূপান্তর/সংস্কার নিশ্চিত করার দাবি করা হলো।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, সঞ্চালক

ধন্যবাদ, জনাব অধ্যাপক এম শামসুল আলম। সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব। এবারে সংস্কার প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশের ওপর ধাপে ধাপে উপস্থাপনা ও আলোচনা করবেন বিশেষজ্ঞরা। প্রথমেই আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, অধ্যাপক এম এম আকাশকে। তিনি কথা বলবেন ন্যায্যতা, সমতা ও স্বচ্ছতা উন্নয়ন কৌশল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন কৌশল নিয়ে।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

ধন্যবাদ ক্যাবকে। তবে বিশেষভাবে অভাব অনুভব করছি, স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন ভাইয়ের। তার উপস্থিতিতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে বহুবার বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছিলো। তার স্মৃতির প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এবং ক্যাব যে নাগরিকদের পক্ষ থেকে তাদের যে প্রস্তাবনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছে সেজন্য ক্যাবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রস্তাবনার যে অংশে স্ট্র্যাটেজিক ও সামষ্টিক দিক আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোকে আমি বিস্তারিত যুক্তি ও ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। প্রস্তাবনার ভেতরে যে লেখা আছে সেটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না। তবে এর পরিপূরক যে ব্যাখ্যা দরকার সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। আমার দিক থেকে আমি যেটা বুঝেছি, এখানে ছয়টি দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব দিক আমি ব্যাখ্যাসহ আলাদাভাবে উপস্থাপন করছি।

প্রথমত, মালিকানা। যেহেতু জ্বালানি একটা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হলো জনগণ, দেশের মানুষ। এটা জাতীয় মালিকানায় থাকতে হবে। জাতির প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। সুতরাং এখানকার সমস্ত গ্যাস, কয়লা, সম্পদ সেটা সমুদ্রগর্ভেই থাকুক নয়তো মাটির তলায়ই থাকুক সেটার মালিক হতে হবে জনগণ এবং জনগণের পক্ষ থেকে জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। এগুলো যখন আমরা উত্তোলন করে কাজে লাগাতে যাবো, তখন সেটার জন্য প্রতিষ্ঠান লাগবে, এন্টারপ্রাইজ লাগবে, ইনভেস্টমেন্ট লাগবে। তখন প্রশ্ন আসবে সেইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন তথা রাষ্ট্র বা সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন হবে এবং তাদের কার্যক্রমের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিনা, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিনা, আংশিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিনা, যৌথ সহযোগিতা থাকবে কিনা, ইত্যাদি।

আমাদের সংবিধান বলে তিন রকমের মালিকানা আমরা সমর্থন করি। আমরা মিশ্র অর্থনীতির দেশ। আমরা সমর্থন করি রাষ্ট্রীয় মালিকানা, আমরা সমর্থন করি যৌথ বা সমবায় মালিকানা, আমরা সমর্থন করি ব্যক্তিগত মালিকানা। বলা হয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠান ও সম্পদের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব রয়েছে এবং যেগুলো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, এটা নিও ক্লাসিকাল অর্থনীতিতেও স্বীকার করে নেওয়া হয়, যেসব প্রতিষ্ঠানের এক্সটার্নাল ইকোনমিক গুরুত্ব রয়েছে, অর্থাৎ আপনি যে কাজ করছেন ওই কাজের ফলাফল লোকসান বা খরচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। ওটার লাভ লোকসান ঢেউয়ের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন ইটের ভাটার ক্ষতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন গ্যাস, বিদ্যুতের দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেলে সারাদেশে একটা মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যাবে, সারা অর্থনীতি লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, সেগুলো বাজার বা ব্যক্তিমালিকানার ওপর নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

আরেকটা বিষয় অর্থনীতিবিদরা বলে থাকেন, যেসব মালিকানা অল্প কিছু

লোকের হাতে সীমাবদ্ধ থাকলে তাদের একটা মনোপলি ক্ষমতা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না বাজারের সঙ্গে বা অন্যখাতের সাথে, সেগুলোরও ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা উচিত নয়। আর বিশেষ করে কতগুলো জিনিস রয়েছে, যেগুলো ন্যাচারাল মনোপলি, মানে আপনি যত বড় পরিসরে উৎপাদন করলেন ঠিক তত উৎপাদন খরচ কম হবে। আর যে এরকম পণ্য বেশি উৎপাদন করবে তিনি রাঘব বোয়ালের মতো একমাত্র রাজায় পরিণত হবে। কারণ খরচের দিক দিয়ে ছোটরা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না। এ ধরনের খাতগুলো মিশ্রমালিকানার অর্থনীতিতে বলা হয় কমান্ডিং হাইটস, এসব খাতকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখতে হবে।

আমি ক্যাবের প্রস্তাবের এই দিকটায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ক্যাব প্রস্তাবে বলছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রধান হতে হবে। আর ব্যক্তি মালিকানা যদি থাকে, তাহলে সেটাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে আলাদা রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে লেভেল গ্রাউন্ডে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। লেভেল গ্রাউন্ড না থেকে এখন যেটা হচ্ছে, বর্তমান সংকটের অন্যতম কারণ হচ্ছে, সরকার নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে ব্যক্তি মালিকদের দ্বারা। লেভেল গ্রাউন্ডে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না করে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ করছে। সরকারের যে রাষ্ট্রীয় গ্যাস, তেলের প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোকে আস্তে আস্তে ডিজবান্ডেল করছে। এবং আস্তে আস্তে সেগুলোর মালিকানা ছেড়ে দিচ্ছে। এরপর যখন ওইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণহীনভাবে দাম বাড়াচ্ছে তখন স্ট্র্যাটেজিক পণ্য হিসেবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সরকার আর রাখছে না। যতগুলো প্রতিষ্ঠান সরকার তৈরি করেছিলো, সেগুলোকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করেছে। আর এগুলোর বিরুদ্ধে যাতে কেউ আন্দোলন সংগ্রাম না করতে পারে, সেজন্য ইনডেমনিটি আইন তৈরি করে রেখেছে। এখানে যার মালিক হবার কথা ছিলো সে মালিক হতে চাচ্ছে না। আর যার মালিক হওয়ার কথা নয়, তাকে মালিক বানানোর জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ। একটা যুক্তি দেখানো হয়, তা হলো দক্ষতা, প্রযুক্তির অভাব, বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির অভাব। ক্যাবের দ্বিতীয় প্রস্তাবটা এই বিনিয়োগের বিষয়ে। যদি আপনি জয়েন্ট মালিকানা করতে চান, তাহলে আগে দেখতে হবে, আমাদের জাতীয় ক্যাপাসিটি আছে কি নাই এবং তারপর দেখতে হবে বিদেশি ক্যাপাসিটি। আমরা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি, মালোয়েশিয়ার পেট্রোনাসের অভিজ্ঞতার থেকে যদি দেখি, দেশীয় সক্ষমতাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। বিদেশি বিনিয়োগের যদি প্রয়োজন হয়ও তবে সেটা ভাড়া করে আনা যায়। বহু আগে সমুদ্র গর্ভে গ্যাস উত্তোলনের বিষয়ে সামিটের আব্দুল আজিজ খানের সঙ্গে আমার টিভিতে একটা আলোচনা হয়েছিলো। সেখানে সামিটের আব্দুল আজিজ খান বলেছিলেন, সরকার যদি আমাদের সুযোগ দেয়, তাহলে বিদেশিদের দিয়ে সমুদ্রগর্ভে গ্যাস উত্তোলনের দরকার নেই। প্রযুক্তি আমরা ভাড়া করে আনতে পারি, তবে আমাদের পুঁজির অভাব আছে। কনসোর্টিয়াম করে যদি আমাদের পুঁজি দেয় তাহলে এটা সম্ভব। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম চেষ্টা করতে হবে দেশীয় উদ্যোগের এবং জাতীয় উদ্যোগকে প্রতিস্থাপন করে বিদেশি উদ্যোগ আসবে না। বিদেশি উদ্যোগ আসবে সাপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক উদ্যোগ হিসেবে এবং এমন ব্যবস্থা এ উদ্যোগের মধ্যে রাখতে হবে, যাতে আস্তে আস্তে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারি।

> **‘দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০। আমি এমপি হওয়ার পরে দুইবার এ আইন সংসদে এসেছে। এটা আসলে রদ করা দরকার। এখন হয়তো রদের প্রশ্ন আসছে। একটা সময় রিনিউ না করলেই হতো। আইনটি ভয়ঙ্কর। এ আইনে বলা আছে, এই আইনের অধীনে যা কিছু করা হবে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না, কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না! আমাদের ক্যাপাসিটি চার্জ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এটা যদি আট লাখ কোটি টাকাও হয় তাও আপনি মামলা করতে পারবেন না। এ টাকা দিতে হবে কাকে? জনগণকে। সরকার আসবে সরকার চলে যাবে কিন্তু চুক্তির দায়, এটা তো ভবিষৎ সরকার, সংসদ ও দেশকে বহন করতে হবে। সে জিনিসগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্নও করা যাবে না। আবার এ আইনে বলা হয়েছে, কোনো টেন্ডার লাগবে না’**
>
> **ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী,** *সংসদ সদস্য*

বিদেশিরা আমাদের প্রতিস্থাপন করবে না বরং আমরা বিদেশিদের প্রতিস্থাপন করবো।

বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। চীন, জাপান ও ভারত, বাংলাদেশকে হাব হিসেবে ব্যবহার করে বিনিয়োগের প্রচন্ড প্রবাহ নিয়ে এসে অনেকগুলো চুক্তি হয়তো করবে এবং নর্থইষ্ট ইন্ডিয়া এলাকাও এর ভেতরে থাকবে। এই জিও-পলিটিকাল আবহাওয়ায় বাংলাদেশের যে পররাষ্ট্রনীতি, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়, এটাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে এ বিনিয়োগ চুক্তিগুলো করতে হবে। এনার্জিখাতে বিশেষ করে সমুদ্রগর্ভে উত্তোলনের ক্ষেত্রে সমুদ্র অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বিবেচনায় রেখে স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব আছে, এসন সবকিছুকে হিসাবে রাখতে হবে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা না করে কোনো এক দিকে ঝুঁকে পড়ে যদি আমরা বৈদেশিক কোনোপক্ষের স্বার্থ দেখতে যাই, তাহলে অবশ্যই আমরা সংকট ডেকে আনবো।

তৃতীয়ত, ভোক্তার জ্বালানি অধিকার। ক্যাবের প্রধান টার্মস এন্ড কন্ডিশন হচ্ছে ভোক্তাদের জন্য জ্বালানি অধিকার নিশ্চিত করা। জ্বালানি অধিকার নিশ্চিত করার মানে হলো সকল লোকের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা। এটা সরকারও স্বীকার নিয়েছে শতভাগ বিদ্যুতের অভিগম্যতা নিশ্চিত সরকারেরই কর্মসূচি। কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরি করলেই বিদ্যুতের শতভাগ অভিগম্যতা নিশ্চিত হয় না। শতভাগ তখনই হয়, যখন বিদ্যুতের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেখানে কিনা সবাই বিদ্যুৎ কিনতে পারবে। ক্যাবের প্রস্তাবে জ্বালানি সংকটের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কী বলা হয়েছে, সেটা আমি একটু পড়ে শুনাচ্ছি- 'বিগত এক দশকে গড়ে বছরে কম-বেশি ৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি হলেও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় গড়ে ১২ শতাংশ'। তার মানে উৎপাদনক্ষমতার ৫০ শতাংশেরও বেশি অব্যবহৃত রয়ে গেছে। আর এই ৫০ শতাংশ অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতার জন্য আমাদের ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে। কোনো বিদ্যুৎ না নিয়ে তারপরেও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সাশ্রয়ী দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্যাবের যে দাবি, তা নিশ্চিত করতে এই জায়গাটা ধরতে হবে। কে বা কারা এই অপরাধটা করলো? কেন এই অপরিকল্পিতভাবে সমন্বয়হীনভাবে এই বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি তৈরি করলো। একসময়ে বর্তমান সরকারি দল মজা করে বলতো, খাম্বা আছে বিদ্যুৎ নাই। এখন যদি বিপরীতপক্ষ সেই পক্ষ মজা করে বলেন যে, বিদ্যুৎ আছে খাম্বা নাই, তাহলে সেটা অন্যায্য হবে কি?

চতুর্থত, দাম। ক্যাবের প্রস্তাবে আরেকটি বিষয় দেখবেন যে, দাম সংক্রান্ত সমস্যা। 'প্রতি ঘন মিটার দেশীয় কোম্পানির গ্যাস কেনা হয় ১.০৩ টাকায়। অথচ স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি হিসেবে গ্যাস আমদানি করা হয় ৮৩ টাকা মূল্যহারে। এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন চার্জই দিতে হয় ২.১৭ টাকা।' কোথায় ১.০৩ টাকায় দাম, কোথায় ৮৩+২=৮৫ টাকা? আপনি এ দামের পার্থক্যে একই পণ্য কিনছেন। জ্বালানি মিশ্রণে আপনি নানা দামের এই গ্যাস কেনার সময় যদি এলএনজির পরিমাণ বাড়ে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানির গড় দাম অনেক বেশি হবে। সুতরাং প্রধান সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, আপনি আমদানিকৃত গ্যাসের ওপর নির্ভরতা তৈরি করছেন। সেটা এড়াতে হলে স্থানীয় পর্যায়ে গ্যাস উৎপন্ন করতে হবে। তা করতে হলে প্রথম দেখতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে গ্যাসের এক্সপ্লোরেশন পসিবিলিটি যতটা আছে, ততটা আপনি উত্তোলন করেছেন কিনা। তা না হলে বুঝতে হবে এখানে কায়েমি স্বার্থ কাজ করছে। বিশেষ কোনো কোম্পানি, বিশেষ কোনো ব্যক্তির কোম্পানি যদি এলএনজি গ্যাস আমদানির চেষ্টা করতে চায় এবং আমদানিতে উৎসাহিত করতে চায়, তবে বর্তমানে যে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম আছে, তাতে সে

অনায়াসে ওই নীতিগুলোই পাশ করাবে, যাতে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে না এবং বাপেক্স তার বিনিয়োগ তহবিলে বরাদ্দ পাবে না।

ক্যাবের প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, ২০২২ সালের গণশুনানিতে জানা যায়, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানির নিকট প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে, তহবিলের ৬৫ শতাংশ অর্থই অব্যবহৃত। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ওই অব্যবহৃত অর্থ কেন আমরা গ্যাস উত্তোলনের কাজে ব্যবহার করলাম না। কেন আমরা বাপেক্সের প্রকৌশলীদের, সক্ষম লোকদের, বদরুল ইমাম ভাইদের মতো লোকদের ধরে রাখতে পারলাম না। বদরুল ইমাম ভাই দেশ ছেড়ে চলে যাননি, দেশকে আঁকড়ে ধরে আছেন, কিন্তু বাকিরা যারা চলে গেছেন, তাদেরকে কেন ধরে রাখতে পারলাম না। ওই টাকা তো আমাদের হাতে ছিলো। যদি জাতীয় স্বার্থকে দেখতাম, সেভাবে অর্থকে কাজে লাগাতাম, তাহলে আজ আমাদের গ্যাসমিশ্রণে দামের গড়টা অনেক বেশি সাশ্রয়ী হতো।

ক্যাব দাবি করেছে, সরকারি উৎপাদন ও সরবরাহ কস্ট প্লাস প্রফিটের ভিত্তিতে হতে হবে। কোথাও কোথাও শুধু কস্ট বেসিসে এবং জনকল্যাণ অনুযায়ী কাউকে কাউকে সাবসিডিও দিতে হবে। যেমন, এখন আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, কৃষি, কুটির শিল্প, এসএমই, এগুলো পিছিয়ে পড়া খাত। এর সঙ্গে জড়িতরা খুবই দরিদ্র ভোক্তা। তাদেরকে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বিদ্যুৎ ও গ্যাস স্ল্যাবিং রেটে, কম দামে সরবরাহ করি, এবং লাভজনক খাতগুলোতে একটু দাম বেশি রেখে এই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেই, তাহলে সেটাই হতো সুশাসন। এভাবে সকলের জন্য জ্বালানি অধিকার নিশ্চিত এবং এই খাতকেও লাভজনক রাখা যেত।

পঞ্চমত, জ্বালানি খাতে নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন। এই নিয়ন্ত্রণের নীতি কিন্তু সরকার এক পর্যায়ে মেনে নিয়েছিল এবং তারা সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বিইআরসি তৈরি করেছে। এটা তৈরি করা হয়েছিল এ কারণে যে, বিইআরসির মাধ্যমে যদি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সেখানে খানিকটা স্বচ্ছতা ও কিছুটা হলেও জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকে। সেখানে সরকার, মালিক ও ভোক্তা, এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। সরকারি খাত ও বেসরকারি খাত তার ব্যয় ও লাভলাভের হিসাব দেয়। ভোক্তাদের কোথায় কি দরকার, আগে ভোক্তার অর্থ কোথায় কিভাবে ব্যয় হয়েছে, সেসব আলাপ উঠে আসে। এরপর কমিশন সামগ্রিকভাবে একটা নিরপেক্ষ মতামত দেয়। কিন্তু সেটা দিতে গেলে অবশ্যই চাপ থাকে। স্বাভাবিকভাবে আমলাতন্ত্রের প্রভাবের কারণে তারা নিরপেক্ষ মতামত দিতে পারে না। যখন তারা পক্ষপাতপূর্ণ রায় দেয়, তখন ক্যাব মামলা করে। মামলা তখন দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। সরকার এইসব ঝামেলার মধ্যে পড়তে চায় না। মামলা হলে লোকজন জেনে যাবে, কে কত বেশি লাভ করলো, কোন কোম্পানিতে বেশি লাভ দেওয়া হলো? কাকে কত দেওয়ার কথার ছিলো, আমদানির দাম কত হওয়ার কথা ছিলো, রপ্তানির দাম কত? পেট্রোলের দাম বিশ্ববাজারে কত, আমদানিতে কত পড়লো, এখানে কেন এত দাম বাড়লো? দাম নিয়ে, এসব বিষয় সামনে আসতে শুরু করলো। এগুলো জনগণের সামনে চলে আসুক এটা সরকার চায় না। তাই ক্রমাগত বিইআরসির ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। অথচ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিল। তার মানে, এখন আর তারা একে কার্যকরী দেখতে চায় না।

এর সঙ্গে আমি যোগ করবো, ইনডেমনিটি আইন যেটা আছে, এটা একটা অসভ্য আইন। পৃথিবীর কোথাও অপরাধ করলে কারো দায়মুক্তি হয় না। বিচার করে যদি তিনি অপরাধী প্রমাণিত হন, তাহলে শাস্তি হয়, নিরপরাধী প্রমাণিত হলে তিনি অব্যাহতি পান। বিচার করারই অধিকার নাই, এই অসভ্য আইন বিশ্বের কোথাও নাই। বাংলাদেশের সংবিধানও এটাকে সমর্থন করে না। বর্তমান সরকারের কাছে তো এটা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না, কারণ তারাই এক সময় ইনডেমনিটির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং সেই আইন বাতিল করেছে।

‘যথাযথ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা এখনো কেন নেই? উপাদন, বিতরণ সবখানেই এ ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। তিতাসে আমরা কখনোই চারশো, সাড়ে চারশো মিলিয়নের উপরে উঠতে পারি না, অথচ তার পাশেই ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিবিয়ানায় বিদেশি কোম্পানি প্রতিদিন হাজার মিলিয়নের বেশি ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করতে পারে। আমরা যদি তিতাসের উৎপাদনকে ওই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের বহু সমস্যা মিটে যেতো’

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম

সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধ্যান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

সুতরাং জ্বালানি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

ষষ্ঠত, কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি। এটা বিশ্বজুড়েই আলোচিত একটা বিতর্ক, কয়লা কি কয়লা না? এখানে ক্যাবের পজিশন শতভাগ কয়লাবিরোধী নয়। ক্যাবের মত হলো, দীর্ঘমেয়াদে কয়লা নয়। স্বল্পমেয়াদে কয়লা ব্যবহার হতে পারে, তবে যতটুকু না হলেই নয়। কয়লা নিয়ে লাভ-ক্ষতির হিসাবটা আমাদের করতেই হবে। কারণ এ কয়লার প্রধান ক্ষতি হলো পরিবেশের ক্ষতি। আর দীর্ঘমেয়াদে যে কয়লা ব্যবহার করা যাবে না, সেটা আমরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছি। বাংলাদেশ সরকার সেটা করেছে, পৃথিবীও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে, প্যারিস এগ্রিমেন্টও স্বীকার করে নিয়েছে। তবে সব দেশই আবার কয়লা ছাড়ার প্রক্রিয়াটিতে ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে এগিয়েছে। কারণ এটা হঠাৎ করে করা যাবে না।

ক্যাব এখানে সমন্বয় করে মোটামুটি ভালো একটা প্ল্যান দিয়েছে। ক্যাব বলেছে, কৃষির জলসেচে প্রান্তিক অঞ্চলে এবং ব্যাটারি চালিত বাড়িগুলোর জন্য আমরা সৌর এবং বায়ু বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারি। ২০০৮ সালে সরকারের জাতীয় পরিকল্পনায় এটা ছিলো। সে অনুযায়ী তাদের কথা ছিলো, ২০২০ সালের মধ্যে মোট যে জ্বালানি ব্যবহৃত হবে তার ১০ শতাংশ হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি। কিন্তু ২০১৬ সালে এসে ওই জ্বালানি নীতি পরিবর্তন করে সরকার যে পরিকল্পনা দিয়েছে তাতে বলেছে ২০৪০ পর্যন্ত নাকি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ১০ শতাংশই থাকবে। তার মানে তারা ১০ শতাংশেই থাকতে চান, যেমন অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় সরকার বলেছিলো, বৈষম্য যা আছে, সেটুকু রাখাই যথেষ্ট। বাড়াবো না, কিন্তু ওইটুকু ইনইকুইলিটিই থাকবে। ওইটুকু ইনইকুয়েলিটি যে কত, এ কথা কিন্তু বলে না। জ্বালানির ক্ষেত্রেও আমি বলতে চাই, সরকারকে বলতে হবে, ১০ শতাংশ না, এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং আলটিমেটেলি এটাই হবে জ্বালানির প্রধান ধারা। ক্লিন এন্ড সাসটেইনেবল এনার্জিই যে ভবিষ্যৎ এটা সারা পৃথিবীই গ্রহণ করে নিয়েছে। বাংলাদেশও সেই পথে আসুক। এই কামনা করে ক্যাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, সঞ্চালক

অনেক ধন্যবাদ এম এম আকাশ। এবার আমি অনুরোধ করছি, অধ্যাপক বদরুল ইমাম, সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধ্যান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব। তিনি গ্যাস খাতে ক্যাবের সংস্কার প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করবেন।

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

শুভ সকাল এবং আপনাদের সালাম। সংস্কার প্রস্তাবনা আপনারা সবাই পেয়েছেন। আমি আমার বক্তব্যে সরাসরি বিভিন্ন সমস্যা, সমাধান ও কি করণীয় সে বিষয়ে আলোকপাত করছি।

প্রথমেই আমি আপনাদের একটা খবর দিতে চাই। সেটা হলো, গ্যাস, জ্বালানি বাপেক্স এসব বিষয়ে আমরা যখন কথা বলছি, এখন যেমন সকাল পৌনে এগারোটা বাজে ঠিক এই মুহূর্তে বাপেক্সের কর্মীরা নতুন একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে এবং সে গ্যাস এখন টেষ্টিং চলছে। আগামী দুই এক দিনের মধ্যে আপনারা ঘোষণা পাবেন সরকারিভাবে যে, বাপেক্সের নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে। বাপেক্স কয়েক বছর আগে সিলেটে আরেকটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। তারও কয়েকবছর আগে বাপেক্স আরো একটি গ্যাস খ্যাত আবিষ্কার করে। যদি আপনি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের তথ্যগুলো জোগাড় করেন তাহলে দেখবেন শেষ তিনটি গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কার বাপেক্সের হাত ধরেই হয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের এখানে এখনো দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স কতটুকু কাজ করবে, করতে পারবে, তার সক্ষমতা কতটুকু, এ ধরনের প্রশ্ন অনেকেই করে। এটা খুবই অর্থহীন কথা। যে প্রতিষ্ঠানটি একটার পর একটা গ্যাস আবিষ্কার করতে পারে, প্রমাণ করতে পারে যে আমরাও সক্ষম, তার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা খুবই অযৌক্তিক।

আমি আমার বক্তব্যের পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে প্রফেসর এম এম

আকাশ যে কথা বলছে, সেটাকে নিয়ে বলতে চাই। ১ টাকা বনাম ৮৩ টাকা। আপনি দেশের গ্যাস ব্যবহার করলে ৮৩ টাকা না দিয়ে ১ টাকা দিতে পারবেন। আমরা এখন যেটা করছি, দেশে গ্যাস নাই, এলএনজি আমদানি করছি। এলএনজি হলো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, এটা আমরা প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে আনি। এবং এটাতেই কখনো কখনো খরচ হয় ৮৩ টাকা প্রতি ইউনিট। এই যে ১ টাকা বনাম ৮৩ টাকা- এটাই কিন্তু বাংলাদেশের জ্বালানি, বিদ্যুৎ খাতের বিরাট বড় একটা ইস্যু। যখন ৮৩ টাকা ব্যয় হয়, তখন সেটা কিন্তু ভোক্তাদের ঘাড়েই চাপানো হয়। যে কারণে আমরা দেখতে পাই, প্রতিনিয়ত আমাদের বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে। এটা ক্রমাগতভাবে আরো বাড়তে থাকবে যতদিন আমার ৮৩ টাকার গ্যাস ব্যবহার করতে থাকবো। আমাদের যে জনসংখ্যা এবং চাহিদা, তাতে কিন্তু এলএনজির ব্যবহার ক্রমাগত হারে বাড়বে। সেইসঙ্গে প্রতিবছর এর দামের পরিমাণও বাড়তে থাকবে। একটা সময় আসবে যখন বাংলাদেশ গ্যাসের জন্য মূলত এলএনজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তখন এই ১ টাকা সমান ৮৩ টাকার হিসাবটা আরো নেতিবাচক হয়ে যাবে।

এখন যে মৌলিক প্রশ্নটা করা যায়, আমরা করে থাকি, তা হলো এই অবস্থা কি ইনএভিটেবল তথা অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা। আমি বলব, অবশ্যই না। বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের ওপর যাদের লেখাপড়া আছে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এটা নিয়ে কাজ করে, তারা একটা কথা স্পষ্টভাবেই বলে, বাংলাদেশের মতো একটা দেশে গ্যাসের জন্য হাহাকার হওয়াটা অস্বাভাবিক। কারণ হচ্ছে, পৃথিবীতে যত গ্যাসসমৃদ্ধ দেশ আছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে যে গ্যাস সম্পদ প্রচুর আছে, দেশি বিদেশি অনেক বিজ্ঞানীই সেটা বলেছেন এবং এখনো বলছেন। পেট্রোবাংলা আর আমেরিকা একটা জরিপ করেছিলো, এখনো বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ হলো ৩২ টিসিএফ। সে হিসেবে এখনো আমাদের প্রায় ৩০ বছরের জ্বালানি মজুদ রয়েছে। অপর দুটি সংস্থা, এর মধ্যে একটি হলো নরওয়ের সরকারি সংস্থা, তারা যৌথভাবে হিসাব দিয়েছে, বাংলাদেশে থাকা গ্যাসের পরিমাণ ৪২ টিসিএফ। এটা একটা প্রাক্কলন, যা কিনা বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে করা হয়। এটা যে একেবারে প্রমাণিত, তা না। তবে আবার ভিত্তিহীনও নয়।

এ সমস্ত জিনিস থেকে যে বিষয়টা আমরা বুঝতে পারি, আমরা গ্যাস সংকটের মধ্যে এখনই নেই। কিন্তু এর পরেও আমরা যদি এমন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করি, যার জন্য ধীরে ধীরে আমরা বিদেশি গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম, এটা তো মোটেই গ্রহণযোগ্য না। এটা জাতীয় স্বার্থবিরোধী। আমরা এখনো দেখছি যে, দেশীয় গ্যাসের যে প্রাপ্যতা, তা প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। যখন থেকে আমরা গ্যাসের ব্যবহার শুরু করলাম। তারপর থেকে ক্রমাগতভাবে কিন্তু গ্যাসের উৎপাদন বেড়েই চলছে এবং এ বৃদ্ধি ২০১৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এরপর থেকেই প্রতিবছর গ্যাস উৎপাদনের হার কমতে থাকে এবং এখন এটা প্রতিনিয়ত কমেই যাচ্ছে। ২০১৫ সালে ম্যাক্সিমাম প্রডাকশন হবার পরে এটা কমতে থাকে এবং এখনো এই কমার হার অব্যাহত। ঘটনা হচ্ছে, গ্যাস উঠছিলো, তার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বাড়ছিলো। ফলে গ্যাস উত্তোলন ও চাহিদার মধ্যে একটা সমতা বজায় ছিলো। এরপরে যখন গ্যাসের প্রডাকশন কমে যাচ্ছে কিন্তু ডিমান্ড কমছে না বরং বাড়ছে। ফলে চাহিদা ও গ্যাসের প্রাপ্যতার মধ্যে ফাঁকটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এটা একটা অশনি সংকেত। সমস্যা হলো যারা আমাদের নীতিনির্ধারক, তারা যখন বলে আমাদের আর দেশীয় গ্যাস নাই, একসময় আমরা অনেক খনন করেছি, এখন আর খনন

‘বাংলাদেশ দেউলিয়া হওয়ার জন্য আর কোনো খাত লাগবে না। এই জ্বালানি খাতই তো যথেষ্ট। যে পরিমাণ টাকা আমরা এখানে অপচয় করেছি, সে পরিমাণ টাকা খাদ্যে ব্যয় করা হলে পুরো জাতির পুষ্টিমান বেড়ে যেতো, শিক্ষায় দিলে শিক্ষা ও দক্ষতার হার বেড়ে যেতো। যদি রিনিউয়েবল এনার্জিতে দিতাম, তাহলে এতদিনে আমাদের হয়তো বিদ্যুৎ সমস্যার অনেকখানির স্থায়ী সমাধান পেয়ে যেতাম। এখন আমাদের এই রিনিউয়েবল এনার্জিকে ঘিরেই সব দাবি করা দরকার। সংবিধানে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জিকে ঘিরে একটা অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে পারি কিনা, এদিকে নজর দেয়া দরকার। এটা এখন একটা বিশাল খাত এবং সংবিধানে এর একটা নির্দেশনা দরকার’

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, *সংসদ সদস্য*

করার মতো বাকি কিছু নাই। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যখন এ ধরনের কথা বলে এটা খুবই আশ্চর্য লাগে, কারণ এটা অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত ও প্রক্কলনের সঙ্গে মেলে না। এরকম কথা যদি বলা হয়, তাহলে আমরা যেখানে বাস করছি, এই ভূখণ্ডকে অবমাননা করা হয়, বাংলাদেশের মাটিকে অবমাননা করা হয়।

এটা কেন করা হয়? এই কারণে যে, আমরা গ্যাস তুলতে পারব না? নাকি বরং এ কারণে যে, দেশীয় গ্যাস উত্তোলন করলে যে লাভ তার চেয়েও বেশি লাভ বিদেশ থেকে গ্যাস আনলে, কারণ এখানে আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা কমিশন বাণিজ্যের সম্পর্ক আছে। কারণ দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করলে তাদের পকেটে অত কমিশন আসবে না। সঙ্গতভাবেই এসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কেন আমরা আমদানির পথে গেলাম আর দেশীয় গ্যাস উত্তোলনের পথকে পরিত্যাগ করলাম। কিছুদিন আগেও আমরা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য দিয়ে হেডলাইন করতে দেখেছি গণমাধ্যমে, তারা বলছেন, আমরা তো অনেক খনন করেছি, বাংলাদেশে আর গ্যাস নাই। আবার এও বলছে, সাগরে আমরা অনেক কোম্পানিকে আনার চেষ্টা করছি এখানে কেউ আসতে চায় না। এইরকম মিথ্যা কথা, এরকম বিভ্রান্তিমূলক কথা বলা বাংলাদেশের মাটিকে অবমাননা করা। দেশের ভূখণ্ড, দেশের যে গঠন, এই সম্পর্কে যারা জ্ঞাত আছে তাদের প্রতি অবজ্ঞা করা, মানে বাংলাদেশের মাটিকে অবজ্ঞা করা। এখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

আমরা এ সমস্যার মধ্যে পড়লাম কেন? বিষয়টা এমন না যে হঠাৎ করে দুই চার বছর ধরে এটা হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ হলো ন্যূনতম গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের জায়গা। গ্যাস যেসব এলাকায় আছে, সেসব এলাকার তুলনায় এখানেই গ্যাস অনুসন্ধান সবচেয়ে কম হয়েছে এবং এখানে পেট্রোলিয়াম-গ্যাস অনুসন্ধ্যানের গতি এতই কম, সারা পৃথিবী যে ধারায় চলে তার ধারে কাছেও আমরা নেই। ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশের যে রিয়েল পটেনশিয়াল, ভেতরে যে পটেনশিয়ালিটি আছে, প্রকৃত যে সম্ভাবনাটা আছে, সেটা কখনোই উন্মোচিত হয়নি। এই কথাটা শুধু এখনকার বা বিগত দশ বছরের জন্য বলছি না। ঐতিহাসিকভাবে আমরা এভাবেই চলে আসছি।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ এতটাই গ্যাসপ্রবণ যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম গ্যাস অনুসন্ধান করেই আমরা ইতিপূর্বে বেশি কিছু গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। তিতাস থেকে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা গ্যাস উত্তোলন করছি। এখনো যা শেষ হয়নি। বা আরো অনেক বড় বড় গ্যাসক্ষেত্র আছে। এই যে উদাহরণ, এখান থেকে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তা না করে এই সমস্যাটাকে আরো প্রকট করে তোলা হয়েছে। অনুসন্ধান আরো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশপ্রেমিক যেকোনো গোষ্ঠীর দায়িত্ব ছিলো এ ধারাটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া। যখন একটা সরকার পরিবর্তন হয়, সব সময় আমরা আশা করি, যে জিনিসগুলো আগে হয়নি হয়তো এ সরকার এসে এটাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে। কিন্তু সে জিনিসটি আমরা দেখতে পাইনি। আমরা দেখতে পাইনি এই অনুসন্ধান না করার ধারাটা বদলে অনুসন্ধানকে উচ্চমাত্রায় নিয়ে যাওয়া। এখন যখন গ্যাস সমস্যা চরমে পৌঁছালো, এটা যখন অর্থনীতিকে সরাসরি আঘাত করা শুরু করলো। ইন্ডাস্ট্রি বলেন আর বাসাবাড়ি বলেন, পুরো দেশ যখন গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তখন গ্যাসের ঘাটতি হয়ে উঠলো একটা চরম সমস্যা। তখনও কিন্তু এ পরিবর্তনটা এলো না। সকলেরই আশা ছিলো, নতুন করে সরকারে যারা ক্ষমতায় আসছেন তারা এটাকে পরিবর্তন করবে। সেটা কখনোই হয়নি বরং সেই ধারাকে বজায় রেখে গ্যাস অনুসন্ধানকে আরো নিচে নামিয়ে এনেছে। অন্য যে ধারা যুক্ত করলো, সেটা হলো গ্যাস আমদানি এবং এই নীতির কারণে অচিরেই আমরা সম্পূর্ণভাবে আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে যাচ্ছি। কিন্তু সঠিক নীতি গ্রহণ করলে গ্যাসের জন্য এখনই আমাদের বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। হয়তো এটা একটা সময় হবে, একেবারেই হবে না তা নয়, তবে এখনই তা হওয়ার কথা ছিলো না। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের গ্যাস এখনো বেশ ভালো

‘ জ্বালানি একটা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হলো জনগণ, দেশের মানুষ। এটা জাতীয় মালিকানায় থাকতে হবে। জাতির প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। সুতরাং এখানকার সমস্ত গ্যাস, কয়লা, সম্পদ সেটা সমুদ্রগর্ভেই থাকুক নয়তো মাটির তলায়ই থাকুক সেটার মালিক হতে হবে জনগণ এবং জনগণের পক্ষ থেকে জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ’

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ

সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

পরিমাণেই রয়েছে। এটা থাকতে কেন আমরা এতটা বিদেশ থেকে আমদানি করবো। কিন্তু আমরা দেখছি, শুধু গ্যাস না, আমাদের পুরো জ্বালানি খাতই শতভাগ আমদানির দিকে চলে যাচ্ছে। এটার বিকল্প ছিলো নিজেরা গ্যাস উত্তোলন করা। গ্যাস অনুসন্ধানের দুর্বলতাই হলো জ্বালানি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

তবে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে আমরা যে ধারাগুলো দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে খানিক ইতিবাচক ধারাও রয়েছে। যেমন ধরেন, অনুসন্ধান হয়নি, হচ্ছে না, এটা আমাদের বহুদিনের চিৎকার। এখন ৪৬টা কূপ খননের একটা প্রোগ্রাম পেট্রোবাংলা হাতে নিয়েছে। এটা তিন বছরের মধ্যে হবে বলা হয়েছিল, বর্তমানে বলা হচ্ছে দুই বছরের মধ্যেই ৪৬টি কূপ খনন করা হবে। খুব ভালো, এটা একটা ইতিবাচক দিক হিসেবে আমরা দেখতে পারি। যদি এটা সাফল্যের সঙ্গে করা যায় তাহলে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু এখন এই যে ৪৬টি কূপ খননের কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে, অতীতেও কিন্তু এরকম ঘোষণা আমরা শুনেছি। কয়েকবছর আগে পেট্রোবাংলা ঘোষণা দিয়েছিলো ১৪৮টি কূপ খনন হবে। সে সময়ও আমরা খুব আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর দেখলাম এটা বাতিল হয়ে গেল। কারা এর পেছনে কলকাঠি নাড়লো, কেন কূপগুলো খনন করা গেলো না, তা আমরা জানতে পারলাম না। এখন আমাদের কথা হচ্ছে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। দুই বছরের মধ্যে এই ৪৬টি কূপ খনন করে অনুসন্ধান করে দেখা যাক কতটা গ্যাস উত্তোলন করা যায়। এ প্রোগ্রামটা যেন ব্যর্থতার দিকে না নিয়ে যাওয়া হয়। যে সুখবরটা আমি প্রথমেই দিলাম, বাপেক্স আজ যে গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেছে, সেটা কিন্তু এই ৪৬টির মধ্যে একটি। এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা যদি সত্যিই বাংলাদেশের মাটি থেকে গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা নেই, সেটা আমাদের ফল দেবে।

সমুদ্রের গ্যাস নিয়ে দুই একটা কথা বলে আমি শেষ করবো। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে আমরা গ্যাস তুলতে পারছি না। এটা একটা জ্ঞাত গ্যাস সমৃদ্ধ এলাকা। কেন? আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা, যেটা আমরা বিভিন্ন দেশ ভাগাভাগি করতে গিয়ে দিয়েছি, সমুদ্র তো এটার ওপর দাঁড়িয়ে বিভক্ত না। সমুদ্রটা পুরো একটাই এলাকা, আমরা বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারত দাগ টেনে এটা ভাগ করে নিয়েছি। মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের একটা দাগ আছে, ভারতের সঙ্গে দাগ আছে। এই দাগগুলো কিন্তু ভূতাত্ত্বিক দাগ না। এগুলো শুধু ম্যাপের ওপর আমাদের কলমের দাগ। ভূগঠনের দিক দিয়ে এই এলাকাটা একই রকম। এখন আপনি যদি মিয়ানমারের দিকে দেখেন, আমাদের দাগের ওপারে গেলেন, সেখানে কিন্তু অনেকগুলো গ্যাসক্ষেত্র আছে। ২০১২ সালে যখন আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা চূড়ান্ত করা হলো, এরপরে কিন্তু মিয়ামানমার গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে চলে গেল। বিগত ১০ বছরে মিয়ানমার অনেকগুলো গ্যাসক্ষেত্র তৈরি করেছে। তারা গ্যাস পেয়েছে এবং তা কাজে লাগাচ্ছে। একই সাগরে যখন আপনি আমাদের দাগের আরেকপাশে যাবেন, সেখানে দেখবেন ভারতীয় সীমানায় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু যদি বাংলাদেশের সীমানায় দাগের ভেতর আসবেন, এখানে একটা ফোটা গ্যাসও খুঁজে পাবেন না। একই সাগর, এদিকে গ্যাস, ওদিকে গ্যাস, অথচ মধ্যখানে গ্যাস থাকবে না, এটা তো একটা অবৈজ্ঞানিক বিষয়। সাধারণভাবেই তো আমরা বুঝতে পারি যে এমনটা ঘটার কোনো কারণ নেই। তাহলে কী দাঁড়ালো, আমরা আমাদের অংশে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করছি না।

> **“সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তুকি দেয়, ভারসাম্য রাখার জন্য। কিন্তু সেই ভর্তুকির অর্থে সত্যিকার অর্থে স্থানীয় প্রযুক্তিতে যে উন্নয়ন সহজ, যে উন্নয়ন সম্ভব তাকে প্রণোদিত করার কার্যক্রম দেখি না। নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে যেভাবে জোরালো করার দরকার ছিলো, যাতে আমাদের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষেরা এ প্রযুক্তি দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে, সেভাবে কাজটা করা হয়নি। শুধু বিপুল চাহিদার গল্পগুলো বলে বাড়তি ক্যাপাসিটি তৈরি করে এবং তাদেরকে প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সংকটের মধ্যে ফেলে রেখেছে”**
>
> **স্থপতি ইকবাল হাবিব**
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

প্রশ্ন হলো, সমুদ্রসীমা চূড়ান্ত হওয়ার পর কেন বিগত ১০ বছরে আমরা গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জোর দিলাম না? এসব প্রশ্ন উঠলে আমরা উর্ধ্বতন কর্মকতাদের মুখ থেকে শুনি তারা বলেন, আমরা তো অনেক কোম্পানিকে বাংলাদেশে আসতে বলি। তারা আসে না! এগুলো সব মিথ্যা কথা। অতিসম্প্রতি যে কোম্পানিটা এখানে আসতে রাজি হয়েছে, এক্সন মবিল, এরা কিন্তু নাম্বার ওয়ান। সেভেন সিস্টার বলা হয় যে নাম্বার ওয়ান ৭টি কোম্পানিকে, যারা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিয়েছিলো, খুব দরিদ্র দেশ থেকে সৌদি আরব, কাতারকে যারা ধনী দেশে পরিণত করেছে, এক্সন মবিল তার মধ্যে শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠান। এরা আন্তর্জাতিকভাবে খুবই প্রভাবশালী।

অবশ্যই তারা অর্থনৈতিকভাবে খুব শক্তিশালী এবং তাদের ভৌগোলিক আধিপত্য আছে। তাদের যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়েও পার পাওয়ার সক্ষমতা আছে। এখন তারা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা তোমাদের সাগর থেকে গ্যাস উত্তোলন করতে চাই। এর অর্থটা কি? কারণ তারা জানে এখানে গ্যাস আছে। সুতরাং এই যে আমরা বিদেশি কোম্পানিকে আনতে চাই, কেউ আসে না। এগুলো কোনো যুক্তি না।

আমাদের এখন গ্যাস দরকার, আমরা এখন যে সংকটে আছি। এ সংকটটা আমাদের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে পীড়া দিচ্ছে। এলএনজি আনতে আমাদের ডলারের ঝুড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই মুহূর্তে আপনাদের গ্যাস দরকার। কিন্তু ইটস ঠু লেইট, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন সাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে নামলেও গ্যাস পেতে পেতে যে সময় লাগবে, তাতে অর্থনীতির অবস্থা বেহাল হয়ে যেতে পারে। আপনারা বিগত ১০ বছরে কেন এ কাজটা কেন করলেন না। ৪৬টি কূপ খননের প্রোগ্রামটি যদি পাঁচবছর আগে করা হতো। তাহলে আজ এরকম সংকট সৃষ্টি হতো না। গ্যাস আমাদের হাতে থাকতো। যদি সাগরের এ প্রোগ্রামটা ১০ বছর আগে করা হতো। তাহলে গ্যাসের সমস্যাই আমাদের থাকতো না, সবকিছু আরো সহজ হতো। এইখানেই হচ্ছে সমস্যা। তাও ভালো কথা, এখন যদি হয়ে থাকে। খনন না হওয়ার চেয়ে দেরি করে হওয়াও শ্রেয়। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে, এসব কাজ আমাদের অতিবিলম্বিত হয়েছে। আরো বিলম্বিত হলে বর্তমানে যে সংকট সেই সংকট আরো গভীর হবে। যাই হোক, যা হওয়ার হয়েছে, অন্তত এখন থেকেই শুরু করতে হবে। বিশেষ করে কূপ খননের প্রোগ্রাম আরো জোরালোভাবে করতে হবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অনুসন্ধান না করার ধারা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

সকলকে ধন্যবাদ।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, সঞ্চালক

ধন্যবাদ অধ্যাপক বদরুল ইমামকে। গ্যাস খাতের অবস্থা আমাদের সামনে এমন প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরার জন্য। এ মুহূর্তে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, স্থপতি ইকবাল হাবিবকে। তিনি স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল, জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ উন্নয়ন নিয়ে ক্যাবের প্রস্তাবনা ও তার ওপরে আলোচনা করবেন।

স্থপতি ইকবাল হাবিব, সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

শ্রদ্ধেয় সুধী আমার সালাম নেবেন। অনেক ধন্যবাদ ক্যাবকে। আমি প্রথমেই ক্যাবের সাবেক সংগঠক স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন ভাইয়ের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তার অনুপস্থিতিতেই আমার আজকে উপস্থিতি, এটা আমার জন্য একটি নতুন ঘটনা। এর আগে ক্যাবের সঙ্গে যা করেছি, তাকে পাশে পেয়েছিলাম। অথচ আজ তিনি নেই। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ক্যাবকে বলতে চাই, সবাই হাল ছাড়লেও ক্যাব হাল ছাড়ছে না। এ ধরনের প্রোগ্রাম জনগণের স্বার্থে, জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজে দেয়। বলে যাওয়াই আমাদের কাজ, এবং আমরা বলে যাচ্ছি।

একটা ছোট্ট শিশু, কিশোরী বলা যায়– গ্রেটা থুনবার্গ। গত কয়েকবছর ধরে সে আমাদের বলে আসছে, সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করুন, বাস্তবতাকে বিশ্বাস করুন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং অর্থনৈতিকভাবে মুনাফালাভের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের ভবিষৎকে আপনারা ধ্বংস করবেন না। সেইরকম ধারণা থেকে আপনাদের একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিতে চাই। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র যখন শুরু হয়, চুক্তি স্বাক্ষর করার পর মূল্য নির্ধারনের পর্যায়ে তখন একটি যৌথ আলোচনা সভায় আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। আমার সঙ্গে বদরুল ইমাম সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্পষ্টভাবে তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, তখনও পর্যন্ত তারা ইআইএ তথা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের কাজটা করেনি। অথচ চুক্তি হয়ে গেছে, মূল্য নির্ধারণের কাজও চলছে। যদিও রাষ্ট্রের তিনটি আইন স্পষ্টভাবে বলছে, এই কাজটি না করে কোনো ধরনের চুক্তি, কোনো ধরনের কার্যক্রম কোথাও শুরু করা যাবে না। তবুও এ কাজটি হয়েছে, রাষ্ট্রেরই তত্ত্বাবধানে, সবার নাকের ডগায় বসে।

> **‘আমরা সমুদ্রের গ্যাস অনুসন্ধান এখনই চাই, দ্রুত চাই, তবে শতভাগ মালিকানা চাই। দরপত্র আহ্বান করে, বিনা দরপত্রে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা চাই না। আপনি কম পয়সায় ট্রানজিট দিচ্ছেন ভারতকে, জাপানকে দিচ্ছেন মাতারবাড়ির অনান্য কাজ, আর আমেরিকাকে দেবেন সমুদ্রের গ্যাস তোলার কাজ, যেখানে আমার স্বার্থ থাকবে না, এটা আমরা হতে দেবো না’**
>
> **জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স**
>
> *সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)*

তখন বলেছিলাম, এখনো বলছি, আমাদের পরিবেশ ধ্বংস হবে এবং তার প্রতিকার চেয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাবো এবং বিদেশিরা আমাদের জ্ঞান দেবে, এটা মোটেও কাম্য না। ক্যাবের মাধ্যমে আমি আজ যে আলোচনা তুলে ধরতে চাই, আজ যে উপস্থাপন করবো সেটি মূলত আমার ভবিষৎ প্রজন্মের পক্ষ থেকে।

আমাদের অবশ্যই স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কৌশল সুনির্ধারিত করতে হবে এবং এটি কেবলই লোকদেখানো কাজ হিসেবে করা যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা কতখানি, সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা উচিত। আপনি একটি দোতলা ভবনের জন্য আটতলা ভবনের বেজমেন্ট তৈরি করতে পারেন না। আটতলা ভবনের ফাউন্ডেশন দিয়ে দোতলা ভবন করতে পারবেন না। পঞ্চাশ শতাংশের অধিক ক্যাপাসিটি তৈরি করে সে ক্যাপাসিটি ফেলে রেখে তার জন্য আপনি জনগণের টাকা ধ্বংস করতে পারেন না। এগুলো করতে গিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য গত ১৫ বছর থেকে ২০ বছর কিছুই করা হয়নি, অবজ্ঞা করা ছাড়া। আমরা যদি চাহিদা পরিমাপ করি এবং তার একটা অংশও নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে পূরণ করে করে এগোতাম, তাহলে এতদিনে পরস্থিতির অনেক উন্নতি হতো। অনেকগুলো নীতিগত বিষয়ে সরকারও আমাদের সঙ্গে একমত, কিন্তু আমরা দেখি, সে অনুযায়ী তারা কাজ করে না। আইনে যা বলা হয়েছে, তাদেরই করা আইন, সেটা আবার তারাই মানে না।

সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তুকি দেয়, ভারসাম্য রাখার জন্য। কিন্তু সেই ভর্তুকির অর্থে সত্যিকার অর্থে স্থানীয় প্রযুক্তিতে যে উন্নয়ন সহজ, যে উন্নয়ন সম্ভব তাকে প্রণোদিত করার কার্যক্রম দেখি না। নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে যেভাবে জোরালো করার দরকার ছিলো, যাতে আমাদের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষেরা এ প্রযুক্তি দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে, সেভাবে কাজটা করা হয়নি। শুধু বিপুল চাহিদার গল্পগুলো বলে বাড়তি ক্যাপাসিটি তৈরি করে এবং তাদেরকে প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সংকটের মধ্যে ফেলে রেখেছে। সরকারের পরিকল্পনা ও নীতি যদি সঠিক না হয়, তাহলে এ ভুর্তকি নিয়ে জনগণ করবেটা কি? এটা কাজে লাগবে না। এ জায়গায় আমাদের কার্যকর জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল নিতে হবে। আলাদাভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ তৈরি হোক। যারা এ ব্যাপারে প্রণোদিত করবে। আমাদের চাহিদার সঙ্গে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় করে এ বিষয়ক কৌশলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের একইসঙ্গে জ্বালানি উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ের কৌশল নিতে হবে।

পাশাপাশি এই কৌশলগুলোকে আমাদের পরিবেশ সুরক্ষায় সক্ষম হতে হবে। মহামারির মতো নেমে এসেছে পরিবেশের ওপর। নানাভাবে আমাদের পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। আমাদের খাল, বন বলে কিছু নেই। ভবিষৎ প্রজন্মের সামনে আমরা দাঁড়াবো কি বলে, সে ভাষা আমার জানা নেই। তাই এ বিষয়ে আর্থিক প্রণোদনাসহ নানাবিধ কৌশলে আমাদের সক্রিয় হতে হবে। শুধুমাত্র এখানে উৎপাদন, পণ্য, বিনিয়োগ, পুঁজি, লাভ, এগুলোই সব নয়। আপনি ভবিষ্যতে টাকা খেতে পারবেন না, টাকা দিয়ে আপনি ভবিষ্যতের এ উত্তাপ কমাতে পারবেন না। উত্তপ্ত হচ্ছে পৃথিবী, শুধু বাংলাদেশ না। আপনারা জানেন কিনা, গত চার সপ্তাহের যে ঘটনা, যখন দুবাইয়ে তাপমাত্রা ছিলো ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর তখন আমাদের দেশে ছিলো ৪১ ডিগ্রি। বুঝতে পারছেন, কি অবস্থা হচ্ছে?

জ্বালানি খাতে দক্ষ, কারিগরি দিক থেকে প্রশিক্ষিত লোকবল নিয়মিত তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আকাশ ভাইয়ের সঙ্গে একমত। বদরুল ইমাম ভাইদের মতো লোকেরা কেন দেশ ছেড়ে চলে গেছে? ভারতসহ অনেক দেশ দেখিয়েছে, কিভাবে তাদের ফেরত আনা যায়। তারা ফেরত এলেই দেশ শক্তিশালী হবে। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, স্বনির্ভর বাংলাদেশ তৈরি করতে। এখন আমরা স্বনির্ভর শব্দটা ভুলে গিয়েছি। যেকোনো কিছুর জন্য আমরা বিদেশিদের দ্বারস্থ হচ্ছি। পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্ত রয়েছে, তাকে যারা পদদলিত করে, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে তাদের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেটা যারা উপেক্ষা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ, প্রতিউচ্চারণ জারি রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্য পরিবেশ অধিকার ও জলবায়ু সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বাধ্য। এটা আমাদের অঙ্গিকার, এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সাংবিধানিকভাবে এটা আমাদের দায়ও বটে। এ দায় প্রতিপালন করতে হবে।

আমরা আমাদের নির্গত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, কার্বন নির্গমন প্রশমনে এখনো সঠিক নীতিমালার ব্যবস্থা করতে পারিনি। শুধু উৎপাদন নয়, পারমাণবিক বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সকল ধরনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার পরবর্তী ঘটনাবলি কি সেটা এখনই আমাদের সুনিশ্চিতভাবে ভবিষৎ প্রজন্মকে জানাতে হবে। এই যে কাজটুকু করছি না, এর জন্য বদরুল ইমাম ভাইয়ের মতো করে বলতে হয়, অনেক বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখনই শুরু করতে হবে। জলবায়ু তহবিল থেকে সহযোগিতা পাওয়ার একটা মুলা ঝুলানো হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে আমরা কোনো ঋণ গ্রহণ করতে চাই না। স্পষ্টভাবে বলছি, আমরা চাই আমাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ। ঋণের মাধ্যমে যেন ঢোল না পেটাই যে, আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। এটা সহযোগিতা তহবিল এবং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত তাই আমাদের প্রাপ্য এখান থেকে আদায় করতে হবে। এ তহবিল দিয়ে আমরা যেন আমাদের সক্ষমতা উন্নয়ন করতে পারি এবং বিকল্প জ্বালানি তৈরি করার জন্য এটা যেন কাজে লাগে, গবেষণা তৈরির কাজে লাগে, লোকবল তৈরির কাজে লাগে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে বলা হয়, আমাদের

সূর্যের আলোর উপযোগিতা কম। কম বলেই যে উৎপাদন করবো না, এ ধরনের আহাম্মকি করার মানে হয় না। আমাদের যা রয়েছে, তা দিয়েই ভালো পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। আমাদের চেয়েও যাদের সৌরবিদ্যুতের উপযোগিতা কম, তারা বসে নেই, সীমিত সম্ভাবনাকেই তারা কাজে লাগাচ্ছে, কারণ এটাই আগামীর পথ। আমরাও বসে থাকতে পারি না। কিভাবে ব্যয় কমানো যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা সব ধরনের চেষ্টা করবো।

আপনারা জেনেছেন, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আমার চাহিদার চেয়ে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর পেছনে যে বিনিয়োগ করতে হয়েছে তার জন্য এখন আমাদের

১ টাকার জিনিস ৮৩ টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। জ্বালানি খাতে সঠিক পদক্ষেপ নিলে এখন আমাদের গ্যাসের জন্য বিদেশে ছুটতে হতো না। কিন্তু তা না করে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে আর আমরা সেই বিদ্যুৎও পাচ্ছি না। একদিকে কম ব্যয়ে উৎপাদনে সক্ষম গ্যাসপ্লান্টগুলো বসিয়ে রাখছি, অন্যদিকে যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র অপ্রয়োজনে করা হয়েছে, তাদের ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছি। এসব করতে গিয়ে আমরা জনগণের অর্থের বিনাশ করছি এবং আমাদের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রবণতা তৈরি করেছি।

আমি মনে করি, ইকুইটি, সাসটেইনেবিলিটি আমাদের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। এটিকে কার্যকর করতে হবে ভবিষৎ প্রজন্মের স্বার্থে। এ বিকল্প জায়গাগুলো এবং পরিবেশ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছু দেখার চেষ্টা করতে হবে। কী হচ্ছে, কি হতে যাচ্ছে আপনারা সেটা জানেন। ভবিষৎ চুক্তিগুলো, চুক্তিগুলোর বিষয়বস্তু তো আপনারা জানবেন। এভাবে চলতে থাকলে দেখবেন যে, চুক্তিগুলো আমাদের কত বড় বিপর্যের মধ্যে ফেলে দেবে। শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ থেকে প্রথাগতভাবে কাগজে কলমে ভালো কথা বললে এমনসব কাজ হবে, যার ক্ষতি আমরা সামাল দিতে পারবো না। ক্যাবের মাধ্যমে আপনারা সবাই এটা জোরালোভাবে তুলে ধরবেন।

আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, সরকারের সদিচ্ছার বিভিন্ন ইঙ্গিত দেখি, তার বাস্তবায়ন চাই। বিভিন্ন সমমনা ছোট ছোট উদ্যোগ দেখি, কিন্তু প্রবল উদ্যোগ চাই। রাষ্ট্রের যে কমিটমেন্ট তা যেন কার্যকরভাবে আমাদের সামনে প্রকাশ পায়, সেটা দেখতে চাই।

ধন্যবাদ সবাইকে।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

অনেক ধন্যবাদ স্থপতি ইকবাল হাবিবকে। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে কিছু করা যাবে না। বিশেষ করে ভবিষৎ প্রজন্মের কথা ভেবে আমাদের এখনই সবকিছু শুধরে নিতে হবে। এবার উপস্থাপনার একেবারে শেষ প্রান্তে কথা বলবেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইন উপদেষ্টা, ক্যাব। আপনাকে বিনীতি অনুরোধ জানাচ্ছি উপস্থাপনার জন্য।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া
আইন উপদেষ্টা, ক্যাব

ধন্যবাদ আপনাদের যারা আজ এখানে উপস্থিত হয়ে ক্যাবের প্রস্তাবনা শুনছেন।

শুরুতে আমিও স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন ভাইকে স্মরণ করছি। ওনার সঙ্গে সবসময় কাজ করার ফলে ওনার যে চিন্তার প্রতিফলন হয়েছে আমাদের মাঝে, সেটার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। ক্যাবের আজকের যে প্রস্তাবনাগুলো আপনারা শুনছেন, সম্মানিত বক্তারা ইতিপূর্বে যা বলেছেন তাদের বক্তব্যের কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। ক্যাবের এখন যে অবস্থান তৈরি হয়েছে এটা তৈরি হবার পেছনে যারা ব্যক্তব্য রেখেছেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন। দীর্ঘ দিনের গবেষণা, আইনি নানা পদক্ষেপ ক্যাবের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। বিগত অন্তত দশ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। সে অভিজ্ঞতার আলোকে ক্যাবের তরফ থেকে যে বিষয়গুলো সামনে আনার চেষ্টা করা হয়, মহামান্য আদালতে যেসব বিষয় উপস্থাপন করে তাদের নজরে আনার চেষ্টা করা হয়, সেখান থেকে অনেক কিছু আমাদের প্রস্তাবনার মধ্যে এসেছে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আরেকটি জায়গায় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত আমরা যে আলোচনাটা করছি, আমাদের সামনে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ আছেন। মূলত এ আলোচনা হওয়া উচিত ছিলো রাজনীতিবিদদের আলোচনা। জ্বালানি সম্পদের মালিকানা কিভাবে জনগণের সম্পদ নির্ধারিত হবে, এটা নির্ধারণ করার জন্য যেসব প্রস্তাবনা আসছে, সে মূল

প্রস্তাবনাগুলো আসার কথা ছিলো রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে। যেহেতু রাজনীতিবিদরা আমাদের সামনে আছেন, তাই তাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করবো এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য।

যেহেতু আমাদের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদে পরিষ্কার করে বলছে, ভূগর্ভস্থ যত খনিজ সম্পদ, মিনারেল আছে সব কিছুর মালিকই হচ্ছে আসলে জনগণ। তাহলে এ জনগণের ক্ষমতায়ন কিভাবে হয়েছে। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলছে, যে জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে তারা ক্ষমতার চর্চা করবে। অর্থাৎ প্রতিনিধিরা যা বলছেন, তা আসলে জনগণ বলছে। তাহলে এই ধারণা থেকেই মালিকানা স্বত্ব আমরা ধরে নিচ্ছি। এখন যে আলোচনা সারা পৃথিবীজুড়ে হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের প্রশ্ন। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের প্রশ্নে প্রথম কথাটিই হচ্ছে, সকলের অংশগ্রহণ, সকলের অভিগম্যতা। যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে, তা সমতাভিত্তিক হচ্ছে কিনা, সবার প্রতি দায়বদ্ধ কিনা, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব আলোচনা কিন্তু আসবে এবং এর বাইরে গিয়ে এখন আমরা যে আলোচনাটাকে বৃহৎ আঙ্গিকে দেখছি তা হলো এনার্জি জাস্টিস। ক্যাবের প্রস্তাবনার মধ্যে সবশেষে এ বিষয়টাকে আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। জ্বালানি ন্যায্যতা বা এনার্জি জাস্টিসের যে জায়গায় সারা পৃথিবীজুড়ে আলোচনা হচ্ছে, দেখবেন কয়েকটি মৌলিক বিষয় সেখানে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। প্রথমত আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি কিনা, অর্থাৎ প্রত্যেকের অ্যাকসেসটা আছে কিনা জ্বালানির ক্ষেত্রে। জ্বালানি অভিগম্যতা নিয়ে এম এম আকাশ স্যার যেটা বলছিলেন, যারা দরিদ্র চরাঞ্চলে বসবাস করছে তাদের আসলে এনার্জির অ্যাকসেস কতটুকু। তাদের আমরা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে আনছি। আমাদের পলিসির মধ্যে সে সমস্ত বিষয় আসছে কিনা? আবার দেখেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি থাকার ফলে আমরা পরিবেশের যে সমস্ত ক্ষতি করেছি, সেখানে আমাদের দায় যতটা না, ধনী রাষ্ট্রগুলো আমাদের ওপর তার চেয়ে বেশি চাপিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের কন্ট্রিবিউশন কম অথচ আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানেও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

‘ জ্বালানি ও জীবনযাত্রা কিন্তু সমার্থক। ফলে জ্বালানির সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, এটাকে কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। এজন্যই এটাকে কেন্দ্র করে জনগণকে জিম্মি করা সবচেয়ে সহজ। খাদ্য দিয়ে জনগণকে জিম্মি করা যেমন সহজ যেকোনোভাবে খাদ্য লাগবেই। জ্বালানিও তেমন, জ্বালানি ছাড়া আমরা কোনোভাবেই বাঁচতে পারবো না। এমনকি আমরা যে মোবাইল ব্যবহার করি। এ মোবাইল ব্যবহার করতে প্রতিদিন ২৭ থেকে ৩০ পয়সার বিদ্যুৎ খরচ হয় চার্জের পেছনে। দেশে আঠারো কোটি মোবাইল সেট। এ মোবাইল ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, আমরা বুঝতেই পারি না। এর মধ্যে এক পয়সা করে বাড়লে কত পরিমাণ খরচ চলে আসে। একসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা দিয়ে মহাদেশ গড়ার কথা আমরা শুনেছিলাম। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে জনগণের ওপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বৃহৎ লুটপাটের আয়োজন এখানে করা হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের এই জ্বালানি খাত ’

জনাব রাজেকুজ্জামান রতন

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে জ্বালানির মূল্য কেমন হবে বা কোন ধরনের জ্বালানি আসবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এইখানেই মালিকানার প্রশ্ন। ভোক্তা যদি নিজেকে মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে তাহলে ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রোল প্লে করতে পারবে না। সাধারণ নাগরিক যাতে জ্বালানি প্রাপ্যতার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে, সে যাতে জেনে বুঝে তার জ্বালানির দাম ঠিক করে, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই সারা পৃথিবীজুড়ে এখন আলোচনা হচ্ছে এনার্জি জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করার।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি জ্বালানির অধিকার নিয়ে কথা। জ্বালানি অধিকারেরও রয়েছে কয়েকটি নির্দিষ্ট

জায়গা। নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি পাওয়া, মানসম্মত জ্বালানি পাওয়া, দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা, সক্ষমতার মধ্যে থাকা, যাতে জ্বালানির প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো হচ্ছে মূল আলোচনা কিন্তু এখন কেবলমাত্র এনার্জি রাইট নিয়ে আমরা আর কথা বলছি না। এখন আমরা এনার্জির ন্যায্যতা নিয়ে কথা বলছি। এখানে হিউম্যান রাইটসের বিশাল একটা অংশ ঢুকে গেছে। বিগত আট বছর ধরে জাতিসংঘ একটা পলিসি তৈরি করার চেষ্টা করছে ব্যবসা ও মানবাধিকারকে কিভাবে আইনি জায়গা থেকে দেখা হবে। জ্বালানির ন্যায্যতা যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে আমার দেশে যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আসছে, যেখানে আমাদের বিনিয়োগ আসছে সেখানে আমরা কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যাতে হিউম্যান রাইটসটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হবে। অষ্টমবারের মতো গত বছর জাতিসংঘে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যেখানে আমার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিলো। এই আলোচনার চতুর্থধাপ ইতিমধ্যে সবার জন্য জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, সেখানে ঢুকলে আপনারা তা দেখতে পারবেন। এবং জাতিসংঘে এখনো এই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

আমরা যেখানেই এই আলোচনাগুলো তুলছি, সেখানে দেখছি যে, সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের বাইরে এখানে অন্য কোথাও এটা সুনির্দিষ্টভাবে নেই যে, মালিকানায় অংশগ্রহণ কিভাবে থাকবে, ক্ষয়ক্ষতির বণ্টন কিভাবে হবে, কিভাবে বণ্টন হবে। এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো আইনি নির্দেশনা এখনো তৈরি হয়নি। আমরা যখন বলবো, এটা আমার অধিকার, তখন প্রশ্ন আসবে এ অধিকার কোথা থেকে আসলো? তাই সংবিধানে, আইনে এর পরিষ্কার নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এ আলোচনা সাধারণ নাগরিকের মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তুলে ধরবো, এর প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা বুঝতে না পারি, এ প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা তুলে ধরতে না পারি তাহলে এই অধিকারের সুরক্ষার জন্য কিন্তু আইন প্রয়োগ করবে না। তাদেরকে আমরা বুঝাতে সক্ষম হবো না। এ কারণে মালিকানা আর স্বত্বাধিকারের জায়গা শুরুতেই বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, এটা যে আমাদের সম্পদ, এর মালিকানা যে আমাদের, সেটা বুঝতে হবে এবং কিভাবে আমরা এর মালিক হলাম তা বলতে পারতে হবে।

এরপর আসছে মূল্যহার নির্ধারণ কৌশল। এক্ষেত্রে আমরা ক্যাবের তরফ বলছি, ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সরংক্ষণের লক্ষ্যে এর উপরে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য যে এনার্জি জাস্টিসের কথা বলছি। আমরা বলছি, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের লাইসেন্সিদের চার্জহার এবং সরকারের রাজস্ব আহরণ ন্যায্য ও যৌক্তিক হতে হবে। সে-জন্য মূল্যহার নির্ধারণ প্রবিধানমালাসমূহ সংশোধন হতে হবে।' এ কথাগুলো আমি কেন বলছি, আমরা গ্যাস নিয়ে মামলা করতে গিয়ে দেখেছি, বিইআরসি যেসব আদেশ দিচ্ছে, সেখানে যে চার্জহার নির্ধারণ করা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে তিতাসের জন্য একরকম চার্জ, অন্যদের জন্য আরেক রকম। কমিশন আইনের ২২ ও ৩৪ ধারা অনুযায়ী গণশুনানির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সেখানে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ক্যাব তাদের সুচিন্তিত মতামতগুলো তুলে ধরে। কিন্তু সেগুলোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ ধরনের অসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মুখে রয়েছে বলে দাবি করছে, সেই আবার ডিভিডেন্ড দিয়ে মুনাফা শেয়ার করছে, তাকেই আবার সিস্টেম লস দেওয়া হচ্ছে এত বেশি করে যেটা কিনা খুবই অসমানুপাতিক এবং এটা ওই প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত দুর্নীতি চালিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ প্রচন্ড রকমের বৈষম্য জারি রয়েছে চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে। আর এই বৈষম্যগুলো আবার মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে এবং ব্যয়কে বড় করে দেখাচ্ছে, ফলে মূল্য বেড়ে যাচ্ছে এবং তাতে আমাদের খরচ বাড়ছে। যে কারণে এ জায়গাটায় আমরা গুরুত্বারোপ করছি, যে প্রবিধানগুলো আছে পরস্পরবিরোধী, সেগুলো সংশোধন করতে হবে। সে সংশোধন প্রক্রিয়ায় সরকার যদি মনে করে, ক্যাব সেখানে অবদান রাখতে পারে, ক্যাব সবসময় সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত আছে।

> **'আইএমএফের শর্তে কোথাও বলা নেই যে, দাম বাড়াতে হবে। তারা বলেছে, ঘাটতি কমাতে হবে। আমরা বলেছি অযৌক্তিক ব্যয় বন্ধ করা গেলে যে অর্থ সাশ্রয় করা যাবে, তা দিয়েই ঘাটতি কমানো যায়। এটা গ্যাস খাতে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা, আর বিদ্যুতে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু একটি টাকাও ব্যয় কমানোর উদ্যোগ তারা নেয়নি। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি করে জনগণের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে'**
>
> **অধ্যাপক এম শামসুল আলম**
> *জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, ক্যাব*

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পাইকারি মূল্যহার

> ‘ ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ হলো ন্যূনতম গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের জায়গা। গ্যাস যেসব এলাকায় আছে, সেসব এলাকার তুলনায় এখানেই গ্যাস অনুসন্ধান সবচেয়ে কম হয়েছে এবং এখানে পেট্রোলিয়াম-গ্যাস অনুসন্ধ্যানের গতি এতই কম, সারা পৃথিবী যে ধারায় চলে তার ধারে কাছেও আমরা নেই। ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশের যে রিয়েল পটেনশিয়াল, ভেতরে যে পটেনশিয়ালিটি আছে, প্রকৃত যে সম্ভাবনাটা আছে, সেটা কখনোই উন্মোচিত হয়নি। এই কথাটা শুধু এখনকার বা বিগত দশ বছরের জন্য বলছি না। ঐতিহাসিকভাবে আমরা এভাবেই চলে আসছি ’
>
> **ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম**
>
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধ্যান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

বিইআরসি আইন ও তার প্রবিধানমালা অনুযায়ী হতে হবে। আমরা এ আইনটিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করছি। ক্যাব থেকে সবচেয়ে বেশি যে আইনটিকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, আদালতে যে আইনটি আমরা বারবার উপস্থাপন করেছি, সেটা হলো ২০০৩-এর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন। কেন আমরা এটা করেছি? আমরা ক্যাব থেকে মনে করছি, এই বিইআরসি নামক প্রতিষ্ঠানটিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শক্তিশালী করতে না পারবো, এই প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানকে স্বাবলম্বী করে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারবে না।

বিইআরসি আইনের ৩৪ ধারায় তাদের কাজের যে পরিধির কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম একটা হলো জনস্বার্থ রক্ষা করা। ক্যাবের কাজটাও একই। আমরা এ্যাডভোকেসি করছি এজন্যই যাতে পাবলিক ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করতে পারি। পাবলিক ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করতে গিয়েই আমরা বিইআরসিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। সে তার কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে কতটুকু আসলে জনস্বার্থ রক্ষা করতে পারছে। আমরা বারবার বলে আসছি, এ কাজটা বিইআরসিকেই করতে হবে। আইনের যদি কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে, দুর্বলতা থাকে, তা সংশোধনের মাধ্যমে আমরা চাইবো বিইআরসির মতো প্রতিষ্ঠানই শক্তিশালী হোক। যে জনগণের কথা বলবে, আমাদের জ্বালানির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। তবে সে লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি, আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আর সেটি হয়নি বলেই কিন্তু আমরা একাধিক মামলায় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। এখানে একটা কথা বল রাখতে চাই, আপনারা জেনে হয়তো আশ্চর্য হবেন, আমরা ক্যাব থেকে যতগুলো মামলা উচ্চ আদালতে নিয়ে গিয়েছি এখন পর্যন্ত একটি মামলাতেও কোনো আদেশ না পেয়ে খালি হাতে ফিরেছি, এমনটি হয়নি। তার মানে আমরা অন্তত একটা জায়গার আপনাদের দেখাতে পেরেছি, আমরা ক্যাব যে বিষয়গুলো নিয়ে আদালতের কাছে যাচ্ছি, সেগুলো সঠিক। ক্যাব যখন বিইআরসির মতো প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কথা বলছে, তাদের যে দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের কথা বলছে, ঠিকমত তারা তাদের কাজগুলো সমাধান না করার কারণে জনগণের যে ক্ষতির জায়গা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, সেখানে অন্তত আদালত মনে করছে যে, ক্যাবের কথাটা সঠিক। আমরা প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত আদেশ চাইতে গিয়েছি, অনেকক্ষেত্রেই এতটাই বেশি পেয়েছি যে, তা অভূতপূর্ব। শুনানি শেষে যে আদেশ আমাদের পাওয়ার কথা ছিলো তার চাইতে অনেকাংশে বেশি পেয়ে বসে আছি আমরা কিছু কিছু মামলায়।

আমরা বলছি, ‘মূল্যহার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান (এসি ব্যতীত) এবং প্রান্তিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্যহার নির্ধারিত কৌশল সংশোধন হতে হবে।’ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, একটা মূল্যহার যখন নির্ধারণের প্রশ্ন আসছে তখন সবার জন্য একই মূল্যহার একটা বাধা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। ভোক্তা পর্যায়ের মূল্যহারের আদেশ যখন দেওয়া হচ্ছে, তখন কিন্তু আমাদের পিছিয়ে পড়া যেসব জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের যে সাংবিধানিক সুরক্ষা আছে, সেটার প্রতিফলন কিন্তু মূল্যহারে ঘটছে না, তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্য নির্ধারণ করার দরকার ছিলো। সে জায়গাটা কিন্তু আমাদের আদেশদাতাদের চিন্তার মধ্যে কখনো আসে না। ক্যাবের অভিজ্ঞতা থেকে এটা এসেছে যে, আরো বেশি শ্রেণীকে মাথায় রেখে তাদের আর্থিক সক্ষমতাকে মাথায় রেখে, আমাদের এ মূল্যহার নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় আনা উচিত।

আমরা বাণিজ্য ও শিল্প কারখানার মূল্যহার কস্টপ্লাস করর কথা বলছি। অর্থাৎ এখানে সরকার ব্যয়টাই শুধু নয়, কিছু মুনাফা ধরে মূল্যহার প্রণয়ন করবে।

এখানে যেটা বাড়তি আসবে সেটাই আবার প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ছাড় দেবে। ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের কাজ হলো জনগণের জন্য ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা। এখানে আমরা যে কস্টপ্লাস এনার্জির কথা বলছি, সেটার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ২০০৮ সালে একটা নীতিমালা প্রণয়ণ করেছে, সে অনুযায়ী মূল্যহার প্রণয়ন করবে বলে। আমরা একাধিক মামলাতে এ অভিযোগ তুলেছি যে, তারা নিজেদের তৈরি করা নিয়ম নিজেরাই মানে না। এ জায়গাটায় বলতে চাই, শুধু আইন বা নীতিমালা থাকলেই হবে না। পাশাপাশি আইন মেনে চলার সংস্কৃতিকেও মনে হয় আমাদের গুরুত্বসহকারে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

আমরা বলছি, দেশি শিল্প ও রপ্তানিমুখী বিদেশি শিল্পের মধ্যে গ্যাসের বণ্টন ও মূল্যহারে বিদ্যমান যে অসমতা রয়েছে, সেটা নিরসন করতে হবে। এখানে যে সুযোগ সুবিধার কথা আমরা বলার চেষ্টা করছি, সে সুযোগ সুবিধার সঙ্গে যেসব সক্ষমতার অভাব রয়েছে, সেগুলো যদি আমলে নেয়া না হয়, সেখানে উন্নতির জন্য যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়া হয়, তাহলে দেশীয় শিল্পকে আসলে উৎসাহিত করতে পারবো না। রেগুলেটরি ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল আমার পরবর্তী আলোচনা। এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা ইতিমধ্যে চলে এসেছে। আমরা আরো বলছি, কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নিউক্লিয়ার এনার্জি ও বায়োমাস এনার্জি বিইআরসি আইনে বর্ণিত এনার্জির সংজ্ঞাভুক্ত হতে হবে। এই কথাটি কেন বলছি, আমরা আমাদের আইনি প্রক্রিয়ায় দেখেছি যে, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনে এনার্জি বলতে প্রধানত তেল, গ্যাসকেই বুঝিয়েছে, নতুন যে জ্বালানি অর্থাৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিষয়গুলো তাতে অন্তর্ভুক্ত নেই।

এখন আমি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রশ্নে মনোযোগ দিচ্ছি। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রণীত যেসব পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা রয়েছে, তাতে ২০৪১ সাল পর্যন্ত মাত্র ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক রাখার কথা বলা হয়েছে। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আছে, ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হবে। এখন আমাদের ভিশন ২০৫০ সাল পর্যন্ত হবে, সেখানে আবার বাংলাদেশ সরকার থেকে বলা হচ্ছে ২০৫০ সালে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্থানান্তরিত করবে। আমরা আসলে কোন নীতিতে চলছি, আমরা নিজেরাও জানি না।

> **“আমাদের অবশ্যই স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কৌশল সুনির্ধারিত করতে হবে এবং এটি কেবলই লোকদেখানো কাজ হিসেবে করা যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা কতখানি, সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা উচিত। আপনি একটি দোতলা ভবনের জন্য আটতলা ভবনের বেজমেন্ট তৈরি করতে পারেন না। আটতলা ভবনের ফাউন্ডেশন দিয়ে দোতলা ভবন করতে পারবেন না। পঞ্চাশ শতাংশের অধিক ক্যাপাসিটি তৈরি করে সে ক্যাপাসিটি ফেলে রেখে তার জন্য আপনি জনগণের টাকা ধ্বংস করতে পারেন না। এগুলো করতে গিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য গত ১৫ বছর থেকে ২০ বছর কিছুই করা হয়নি, অবজ্ঞা করা ছাড়া”**
>
> **স্থপতি ইকবাল হাবিব**
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

একটা দেশ, যার স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে গেছে, এতদিনেও তার নিজস্ব কোনো জ্বালানি নীতি নেই। ক্যাবের তরফ থেকে আমরা একটা জ্বালানি নীতি সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছি। তা নিয়ে আমাদের সঙ্গে তারা এখন পর্যন্ত কোনো আলোচনার উদ্যোগ নেয়নি। এর মধ্যে যেটা হলো, সরকার জাপানি সংস্থা জাইকাকে জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা তৈরি করার দায়িত্ব দিলো। একসময় ভূগর্ভস্থ সম্পত্তি কোথায় কি আছে, শুধুমাত্র সে তথ্য পাচার করার কারণে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে মামলা হয়েছে বিভিন্ন সংস্থার পরিচালকের বিরুদ্ধে। ১৭ বছর ধরে মামলা লড়তে লড়তে তাদের পরিবার হয়রান হয়ে গেছে। অথচ এখন আমার দেশের সম্পদগুলো কোথায় আছে তা কিভাবে ব্যবহার হবে, সে পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দিচ্ছে জাপানি সংস্থাকে। একটা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে অন্য দেশকে দায়িত্ব দিলে যে তথ্য পাচার হয়ে যায় এটা বিবেচনায় রাখা হয়নি। জাইকার মতো একটা বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন আমার দেশের জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য। এটা কখনো মাস্টারপ্ল্যান হতে পারে না। তারা আমাদের বিশেষ অবস্থাগুলো বুঝতেই পারবে না।

আর এটা তো দেশের ভেতর থেকেই করা সম্ভব। এতই যদি বিশেষজ্ঞের ঘাটতি থাকতো, তাহলে ক্যাবের কাছে আপনারা এ পরিকল্পনা দিতেন, ক্যাবই করে দিতে

পারতো। সে সক্ষমতা তো ক্যাবের কাছেই আছে। আপনারা আমাদের কাছে না এসে কেন জাইকার কাছে গেলেন। পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় দেখানো যাবে না যে, দেশের জ্বালানি নীতিমালা তৈরি করার জন্য অন্য একটা দেশকে বা কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমরা সব দিক থেকেই ব্যতিক্রম। যাই হোক, জাইকার এই পরিকল্পনায়ও কিন্তু ২০৫০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকার যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ঘোষণা দিচ্ছে ২০৫০ সালে, জাইকার পরিকল্পনায় তার প্রতিফলন নেই। তাহলে জাইকাকে যে করতে দিলো, তাদের সঙ্গে তো সরকারের ভাবনার কোনো সম্পর্ক নেই। কোথায় ২০৫০ সাল পর্যন্ত ১২ শতাংশ, আর কোথায় সরকারের শতভাগ জ্বালানির ঘোষণা! এখানে তো মাথা ঠিক রাখারই উপায় নেই। এটা আসলে কোন নীতি, কি নিয়ে আলোচনা করবো এই জায়গায়? ক্যাব মূলত এ জায়গাটাই ধরতে চেয়েছে। এ সেক্টরের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড রকমের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনা। জ্বালানি খাতে যদি অব্যবস্থাপনা হয়, যদি পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সঙ্গতি না থাকে, যদি জনগণের মতের প্রতিফলন না থাকে, তাহলে কোন ধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে একটা দেশ থাকতে পারে, সেটা বর্তমান পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই বোঝা সম্ভব। আমরা সেটা থেকেই উত্তরণ ঘটাতে চাচ্ছি। সেটার জন্যই আপনাদের সামনে এ প্রস্তাবনাগুলো হাজির করার চেষ্টা করছি।

আমরা বলছি, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমদানি বিইআরসি আইনের আওতায় বিইআরসি'র নিয়ন্ত্রণে হতে হবে। এ কথাগুলো বলছি নানা ঘটনার অভিজ্ঞতার সুবাদে। এলএনজি আমদানি করছেন কারা? এলপিজি আমদানি করছেন কারা? ২০০৮ সালে সর্বশেষ বিইআরসি তাদের এলপিজি সংক্রান্ত মূল্য নির্ধারণের আদেশ দিয়েছিলো। ২০১৫ সালে এসে ক্যাবকে আলাদাভাবে মামলা করতে হয়েছে যে, যারা এলপিজি আমদানি করে তারা নিজেরা কিভাবে এলপিজির মূল্য নির্ধারণ করে। কিভাবে তারাই মূল্য নির্ধারণ করে, যারা ডিলারদের মাধ্যমে আমাদের কাছে বিক্রি করছে। এ মামলার সুবাদে এখন আদালতের নির্দেশে প্রতি মাসে সৌদি আরামকোর মূল্য অনুযায়ী বিইআরসি এলপিজির দাম নির্ধারণ করছে। যদিও মাঠপর্যায়ে সেই দামে এলপিজি পাওয়া যাচ্ছে না।

এসব ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগে মূল সমস্যা হলো, সরকার নিজেই কড়াকড়ি চায় না। আগে বিইআরসি আইনে বলা ছিলো, এনার্জির মূল্য আপনি বছরে মাত্র একবার সমন্বয় করতে পারবেন। কিন্তু সরকার যখন গ্যাসের মূল্য একাধিকবার বৃদ্ধি করলো, তার বিরুদ্ধে আমরা আদালতে গিয়েছি। তখন সরকার চিন্তা করছে আমাদের ঠেকাবে কি করে। তখন তারা আইনটা সংশোধন করে বছরে যতবার খুশি ততবার মূল্যবৃদ্ধির নিয়ম করে নিয়েছে। আমাদের পরিবর্তন যদি এ আঙ্গিকে হতে থাকে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য আইনকে আশ্রয় করে জনগণকে সুরক্ষার দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেখানে যে সামান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো, তাও তুলে নেয়া হলো? জনগণকে আরো বিপদের মধ্যে ফেলা হলো? এ পরিবর্তনে ক্যাবের সিরিয়াস আপত্তি আছে। জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের এ আপত্তি। আমরা বারবার বলেছি, এখানেও আমাদের প্রস্তাবনার মধ্যে বলা হচ্ছে, বিইআরসিকেই মূল্য নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিতে হবে। আমদানির সময়ও আমরা বলেছি, বিদেশ থেকে যখন আমদানি করছি তখনও বিইআরসির নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এখন কে কোথা থেকে স্পট মার্কেট থেকে মাল নিয়ে আসছে, এলজিপি অথবা এলএনজি নিয়ে আসছে, সেই দামটা ন্যায্য কিনা সেটা তো দেখতে হবে।

গণশুনানির মাধ্যমেই মূল্য নির্ধারণ হতে হবে। একটা দাম তারা বললো, আর বিইআরসি তা পাস করে দিলো, এটা হবে না। আবার পাস থ্রু করে দেওয়া আর যাই হোক পাবলিক হেয়ারিংয়ের উদ্দেশ্য না। পাবলিক হেয়ারিং করতে বললাম, আইন মানার জন্য, নিয়ম মানার জন্য। কিন্তু স্টেকহোল্ডার যারা রয়েছে তাদের কোনো ধরনের মতামতকে আমলে নিলাম না, এটা হতে পারবে না। ক্যাবের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় আমরা যে কথাগুলো বলেছি, তা অনুসরণ না করে একটা আদেশকে সরকার, বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তিমালিকদের দাবি অনুযায়ী লিগালাইজ করে দেওয়াতে আমাদের আপত্তি রয়েছে। এসব প্রশ্ন নিয়ে বিইআরসিতে প্রতিকার না পেয়ে আমরা যখনই আদালতে গিয়েছি, আদালত আমাদের বক্তব্যকে সঠিক মনে করেছে। আমদানির নাম করে অর্থ পাচার হয়, বাড়তি ব্যয়ের দাম ভোক্তার কাঁধে চাপানো হয়। এসব ক্ষেত্রে বিইআরসির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবকিছু ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজকে এ জায়গায় সরকার নিয়ন্ত্রণহীন। আমরা এ জায়গায় নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য বলছি, এ আমদানি করতে হবে বিইআরসির তত্ত্বাবধানে। তাহলে একটা পাবলিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ দায়িত্বটা থাকবে। আমাদের সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকবে, সেটাকে আরো উন্নত করার সুযোগ থাকবে।

২০০৩ সালে বিইআরসি আইনটি পাশ হওয়ার পর থেকে সরকার কখনোই পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের মূল্য বিইআরসিকে নির্ধারণ করতে দেয়নি। তাহলে একটা আইন আছে, সে আইন শুরু থেকেই ভঙ্গ করেছে সরকার নিজেই। এখানে সরকারের অযুহাত হলো, এটা অনেক বড় বিষয়, অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার, বিইআরসি পারবে না, বিইআরসি অনেক ছোট প্রতিষ্ঠান। কি যুক্তি! আমরা এ প্রশ্নগুলো তুলেছি ক্যাবের তরফ থেকে এই আশা করে যে, সরকার এখানে স্মার্ট ভূমিকা নেবে, আইনের এসব ব্যত্যয় শুধরে নেবে। কিন্তু সরকার আরো স্মার্ট ভূমিকা নিয়ে বললো, যে বিইআরসিরই আসলে

কোনো প্রয়োজন নেই। বিশেষ প্রয়োজনে সরকার নিজেই এনার্জির দাম নির্ধারণ করতে পারবে। তাহলে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আর লাভ কি? এ আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে মাঠে আছে যে, বিইআরসিকে বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। আমাদের চরম আপত্তি আছে এ প্রস্তাবনায় এবং আমরা ক্যাবের তরফ হতে এখন পর্যন্ত বলবো বিইআরসির যত রকমের সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন, আমরা চাইবো যে এটা প্রতিষ্ঠানটা টিকে থাকুক। আমরা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে চাই না। এইরকম একটা প্রতিষ্ঠান থাকলে জনগণের স্বার্থের প্রয়োজনে পরিবর্তিত সময়ে আমরা হয়তো তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবো।

আরেকটা বিষয়ে কথা বলতে চাই। সরকারের এখন যে ভূমিকা, সেটা হচ্ছে রেগুলেটর প্লাস বিজনেসম্যান। এ জায়গা থেকেও কিন্তু বের হয়ে আসতে হবে। সরকার রেগুলেটরের জায়গায় ভূমিকা পালন করবে, আবার সে জায়গায় থেকে বিজনেসও করবে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান খুলে, এটা স্বার্থসংঘাতপূর্ণ। এই যে জনগণের অর্থ নিয়ে ২৫টি ব্যাংকে লগ্নি করছে পেট্রোবাংলা। অথচ এই তহবিল করা হয়েছিল জনগণের টাকা নিয়েই। কথা ছিল এটা জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে ব্যবহার করা হবে। অথচ সেই টাকা ব্যাংকে রাখছেন, জনগণ তা নিয়ে আবার সুদ দিচ্ছে। জনগণের দেয়া টাকা থেকে আবার মুনাফা করছেন জনগণকে দিয়েই। এটা তো আইনসম্মত হলো না। ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। এগুলো অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এখানে রাজনীতিবিদগণ উপস্থিত আছেন আপনাদেরকেও অনুরোধ করবো, আমাদের সঙ্গে যদি আরো বসতে হয় আমরা আপনাদের আরো সময় দিতে চাই। এই বিষয়গুলো আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

ধন্যবাদ সকলকে।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

অনেক ধন্যবাদ জ্যোতির্ময় বড়ুয়াকে। এত দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা করলেও পিনপতন নীরবতায় সবার অংশগ্রহণ দেখছি, এটা উৎসাহব্যঞ্জক। বোঝা যাচ্ছে, এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এগুলোই। আমি উপস্থিত সকলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্যাবের পক্ষ থেকে এখন জ্বালানি খাত ঘিরে ১৩ দফা দাবিনামা পেশ করবেন অধ্যাপক এম শামসুল আলম।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ক্যাব

সবাই আলোচনাটি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন ক্যাবের তরফ থেকে জ্বালানি খাত ঘিরে আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরছি।

ভোক্তা যেন সঠিক দাম, মাপ ও মানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য মূল্যহার নির্ধারণসহ বিদ্যুৎ, জ্বালানি, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, সমতা, যৌক্তিকতা ও

> **‘ কমিশন আইনের ২২ ও ৩৪ ধারা অনুযায়ী গণশুনানির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সেখানে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ক্যাব তাদের সুচিন্তিত মতামতগুলো তুলে ধরে। কিন্তু সেগুলোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ ধরনের অসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মুখে রয়েছে বলে দাবি করছে, সেই আবার ডিভিডেন্ড দিয়ে মুনাফা শেয়ার করছে, তাকেই আবার সিস্টেম লস দেওয়া হচ্ছে এত বেশি করে যেটা কিনা খুবই অসমানুপাতিক এবং এটা ওই প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত দুর্নীতি চালিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ প্রচন্ড রকমের বৈষম্য জারি রয়েছে চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে। আর এই বৈষম্যগুলো আবার মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে এবং ব্যয়কে বড় করে দেখাচ্ছে, ফলে মূল্য বেড়ে যাচ্ছে এবং তাতে আমাদের খরচ বাড়ছে। যে কারণে এ জায়গাটায় আমরা গুরুত্বারোপ করছি, যে প্রবিধানগুলো আছে পরস্পরবিরোধী, সেগুলো সংশোধন করতে হবে। সে সংশোধন প্রক্রিয়ায় সরকার যদি মনে করে, ক্যাব সেখানে অবদান রাখতে পারে, ক্যাব সবসময় সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত আছে ’**
>
> **ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া,** *আইন উপদেষ্টা, ক্যাব*

জবাবদিহি তথা জ্বালানি সুবিচার (Energy Justice) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিসমূহ:

(১) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে প্রতিযোগিতাবিহীন যেকোনো ধরনের বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হতে হবে।

(২) সরকার ব্যক্তিখাতের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির শেয়ার ব্যাক্তি খাতে হস্তান্তর করবে না, আইন দ্বারা তা নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতভূক্ত সরকারি ও যৌথ মালিকানাধীন সকল কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের সকল আমলাদের প্রত্যাহার করতে হবে।

(৪) নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা স্বাধীনভাবে উভয় খাতের কোম্পানির/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে। সে-জন্য আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসাবে মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি-প্রবিধান অনুসরন ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারি ও লাইসেন্সিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এবং ডাউনস্ট্রীম রেগুলেটর বিইআরসিকে সক্রিয়, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

(৫) মুনাফা ব্যতিত কস্ট বেসিসে ৫০ শতাংশের অধিক বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন সরকারী মালিকানায় হতে হবে। কস্ট প্লাস নয়, সরকার শুধু কস্ট বেসিসে বিদ্যুৎ, ও জ্বালানি সেবা দেবে।

(৬) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ যথাক্রমে গ্যাস অনুসন্ধান, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় ভোক্তার ইকুইটি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হতে হবে।

(৭) প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় কয়লা ও তেলের অনুপাত কমাতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ বৃদ্ধি এবং নবায়যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বারা জ্বালানি আমদানি নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

> **বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম চেষ্টা করতে হবে দেশীয় উদ্যোগের এবং জাতীয় উদ্যোগকে প্রতিস্থাপন করে বিদেশি উদ্যোগ আসবে না। বিদেশি উদ্যোগ আসবে সাপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক উদ্যোগ হিসেবে এবং এমন ব্যবস্থা এ উদ্যোগের মধ্যে রাখতে হবে, যাতে আস্তে আস্তে আমরা স্বয়ংসর্ম্পূণ হয়ে উঠতে পারি। বিদেশিরা আমাদের প্রতিস্থাপন করবে না বরং আমরা বিদেশিদের প্রতিস্থাপন করবো**
>
> **অধ্যাপক এম এম আকাশ**
>
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

(৮) জলবায়ু তহবিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎস থেকে উক্ত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ঋণ নয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি/আদায় নিশ্চিত হতে হবে। এবং সে ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্থদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(৯) বিদ্যুৎ, জীবাশ্ম ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন নীতি, আইন, বিধি-বিধান ও পরিকল্পনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্পাদিত প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(১০) জ্বালানি নিরাপত্তা সুরক্ষার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে 'Energy Price Stabilized Fund' গঠিত হতে হবে।

(১১) ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থী হওয়ায় (ক) দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ রদ হতে হবে, এবং (খ) বাংলাদেশ রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে সংযোজিত ধারা ৩৪ক রহিত হতে হবে। এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'কে ফিরিয়ে দিতে হবে।

(১২) ইতোমধ্যে (ক) বাপেক্স ও সান্তোষের মধ্যে মগনামা-২ অনুসন্ধান কূপ খননে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তি, (খ) বিআরইবি ও সামিট পাওয়ার লিঃ-এর মধ্যে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি, এবং বিপিডিবি ও সামিট পাওয়ার লিঃ-এর মধ্যে সম্পাদিত মেঘনাঘাট পাওয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি বেআইনি ও জনস্বার্থ বিরোধী, এবং (গ) জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থী প্রতীয়মান হওয়ায় এ-সব চুক্তি বাতিল হতে হবে। অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত অনান্য চুক্তিসমূহও যাচাই-বাছাইক্রমে বাতিল হতে হবে। সেই সাথে জ্বালানি সনদ চুক্তি ১৯৯৪ স্বাক্ষরে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

(১৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে সম্পাদিত সকল চুক্তি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত মডেল চুক্তি মতে হতে হবে।

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ মতে, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ তথা ভোক্তা সাধারণ এবং জনগণের অভিপ্রায়ের চরম

অভিব্যক্তিরূপে দেশের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ফলে ভোক্তা পক্ষের উপস্থাপিত উল্লিখিত রূপান্তর/সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী চলমান জ্বালানি রূপান্তর/সংস্কার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩ দফা দাবি করা হলো।

এ দাবিনামা তুলে ধরতে আজ দুইজন সংসদ সদস্য এবং বিশিষ্টজনদের আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা আশা করি, সংসদের প্রতিনিধি হিসেবে তারা বাকি সংসদ সদস্যদের কাছে জনগণের এ দাবি তুলে ধরবেন, সংসদে তারা তা বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। তাছাড়া আমাদের এ সংস্কার প্রস্তাব এবং এ দাবিসমূহ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণে নিয়োজিত প্রত্যেকেই জনগণের স্বার্থে, ভোক্তার স্বার্থে আমলে নেবেন এবং নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রতিবাদ জানাবেন। যেভাবে পাইপলাইনে গ্যাস রপ্তানি বন্ধের ব্যাপারে সারা দেশবাসী একতাবদ্ধ হয়েছিলো, টাটার চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে একতা হয়েছিলো, নাইকো চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে একতাবদ্ধ হয়েছিলো, যেভাবে এশিয়া এনার্জিকে এখান থেকে বহিস্কার করেছিলো, সেইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আজকের সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমরা দক্ষতার সঙ্গে আন্দোলন করতে পারি। আমরা সে শুরুটা করলাম। আপনারা সবাই সমবেতভাবে জনগণের সঙ্গে এ যাত্রায় যোগ দেবেন, এ প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

অনেক ধন্যবাদ, অধ্যাপক এম শামসুল আলম। এখন আমরা এসব প্রস্তাবনার ওপর আমন্ত্রিত অতিথিদের আলোচনা শুনবো। তারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক নেতা। আমি শুরুতে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, জনাব রাজেকুজ্জামান রতনকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

জনাব রাজেকুজ্জামান রতন, *সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)*

ধন্যবাদ, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশকে, আর এখানে যারা উপস্থিত আছেন।

এতক্ষণ আমরা গবেষণামূলক বক্তব্য শুনলাম দেশের স্বার্থে, তা তো আর বলা যাবে না, কারণ আমাদের চেয়ে যারা দেশকে বেশি ভালোবাসে তারাই ক্ষমতায় আছেন। আমরা যদি বলি তারা মনে হয় দেশের বিপক্ষে, তাহলে আবার এটা বিপজ্জনক হয়ে যায়। তারপরও বলছি, জনগণের স্বার্থে এ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা উচিত। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি মনে করি বিজ্ঞান ও গবেষণার আলোকে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার। তবে রাজনীতির মূল প্রশ্নটা হলো আমাদের সম্পদের বণ্টন কিভাবে হবে। মালিকানা ও বণ্টনের এ জায়গাগুলোতে ক্রমাগত আমরা নিজেদেরকে দুর্বল করে ফেলছি। এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা আছেন তাদের পরিকল্পিত পদ্ধতিই হচ্ছে নিজেদের দুর্বল করা। এক সময় বিদেশিরা আমাদের সাহায্য করার জন্য আসতো। আমরা দেখেছি, বিদেশিদের সহযোগিতা যত বাড়ে, আমাদের অসহায়ত্বও ততো বাড়ে। এখন দেখি দেশের উন্নয়ন যত বাড়ছে, দেশের মানুষের অসহায়ত্ব ততো বাড়ছে এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে এটি দৃশ্যমান।

আমি কয়েকটা বিষয় এখানে তুলে ধরতে চাই। ১৯৯৫ সালে যখন জ্বালানি বিষয়ক পলিসি গঠন করা হয়েছিলো সেখানে অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও একটা কথা বলা হয়েছিলো যে, নিজস্ব জ্বালানির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আর বলা হয়েছিলো পরিবেশ বান্ধব এবং সাসটেইনেবল এনার্জি নিশ্চিত করতে হবে। ১৯৯৫ সালের ঘটনা। অথচ আজ এতদিন পরে এসে দেখেন, আমরা কিরকম বিপরীত পথে হেঁটেছি। এর ফলে অতিউৎপাদন, অতিরিক্ত ঝুঁকি, অতিরিক্ত দাম, অপচয় এবং অনিশ্চয়তার এক দুষ্টচক্রের মধ্যে আমরা আটকা পড়ে গিয়েছি। আগে একটা কবিতার মধ্যে আমরা পড়েছি, এমন একটা ছাত্র ছিলো তার শুধু ক্ষিদে পেতো। আবার খাবার পরেই ঘুমিয়ে পড়তো। আমাদেরও হয়েছে ঠিক এইরকম অবস্থা যে, দুর্নীতি বাড়লে দাম বাড়ে, আর দাম বাড়লে আবার দুর্নীতি বাড়ে। এমন একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে পুরো জাতিকে আটকে ফেলা হয়েছে।

ক্যাপাসিটি চার্জের নামে যেটা বলা হচ্ছে, সেটা আসলে কম্পেনসেশন ফর করাপশন। একজন দুর্নীতি করবে আর বাকি মানুষজন তার ক্ষতিপূরণ দেবে এবং এর দায় ভোগ করবে। আমাদের বাংলাদেশে চার কোটি দশ লাখ পরিবার আছে। তার মধ্যে ৯৫ শতাংশ ধরলে, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবার আছে প্রায় চার কোটি পরিবার। তারা কিন্তু এ জ্বালানির দামের বোঝাটা বহন করছে। আর জ্বালানির দামের মজাটা ভোগ করছে হয়তো দশ লাখ পরিবার এবং তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য আবার দেশের বাইরে থাকে। ফলে দেশের কি হলো না হলো এতে তাদের কিছু যায় আসে না।

আমাদের মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এখনো আমরা দেখছি, ২০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বলা হয়েছে আমাদের সিষ্টেম লস হচ্ছে ৭.৭৪ শতাংশ। এটা আবার সরকারের মতে, এখানে বেশিও হতে পারে। এই যে প্রায় ৮ শতাংশ সিস্টেম লসের কথা তারা বলছে, এতটা কিভাবে সম্ভব? এটা কি সিস্টেম লস না এটা সিস্টেমের করাপশন? বিদ্যুতের দাম যদি প্রতি ইউনিটে এক টাকা করে বাড়ানো হয়, তাহলে বছরে জনগণের ওপর বর্তায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার মতো। লোকে হয়তো বলে যে, এক ইউনিটের জন্য এক টাকা করে বেড়েছে। আসলে এটা প্রত্যক্ষভাবে সাড়ে আট হাজার কোটি। আর পরোক্ষভাবে এর প্রভাবে পাঁচগুণের বেশি দাম বেড়ে যায়। যেমন আমাদের চার লাখ তিয়াত্তর হাজার সেচ সংযোগ আছে। সেখানে আমাদের বিদ্যুৎ

লাগে আড়াই হাজার মেগাওয়াট। এই বিদ্যুতের দাম সেচে বাড়ার মানে কি? তার প্রভাব পড়বে কৃষির ওপর। আমাদের শিল্পের ওপর এই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবটা দুইভাবে পড়ে। শিল্প উৎপাদনের খরচ বেড়ে গেলে তাতে জনগণের ওপর বর্ধিত দামের বোঝা চাপে। আরেকটা হলো দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের দাম বেশি হলে বলে, বিদেশ থেকে আমদানি কর। তার মানে বাইরে থেকে আমদানি করার সুযোগটা বৃদ্ধি করা হয় এবং এতে আমাদের স্বনির্ভরতা সংকুচিত হয়।

আপনাদের আলোচনার মধ্যে দেখলাম সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে দাম অনেক কম। কিন্তু কেন? এমনকি ত্রিপুরা পরিকল্পনা করছে, তারা সৌরবিদ্যুতের হাব তৈরি করবে আর বাংলাদেশে সে বিদ্যুৎ রপ্তানি করবে। আচ্ছা, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর আমাদের কুমিল্লার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কি এমন পার্থক্য আছে? তাদের এবং আমাদের আবহাওয়া আর জলবায়ু কাছাকাছি, সৌরশক্তির হার কাছাকাছি। অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের বেলায় আমাদের তুলনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেগাওয়াট প্রতি তাদের ব্যয় পাঁচশো ডলারের কম। এই যে এত কমে ওরা উৎপাদন করতে পারে, আমরা কেন পারি না? অবশ্য তাদের কথা মতো আমরা তো বেহেশতে আছি তার জন্য হয়তো জিনিসপত্রের দাম এত বেশি থাকতে পারে। সেজন্য হয়তো আমরা বেশি দামে উৎপন্ন করে একটু ভাব নিতে চাই। কিন্তু ভাবের ভার পড়ে তো পরে জনগণের ওপর।

একটা সময় পাওয়ার বলতে আমি অন্য বিষয় বুঝতাম। কিন্তু এখানে বিদ্যুৎকে আমরা পাওয়ার বলছি। আর আমাদের পাওয়ারে যারা আছেন, তাদের পাওয়ার হলো দুর্নীতি, দমন, দখল করার পাওয়ার। আরেকটা পাওয়ার আছে তাদের, নিজেরা নিজেদের দায়মুক্তি দেওয়ার পাওয়ার। ফলে বিদ্যুতের নানা বিষয় নিয়ে আমরা সাধারণ মানুষ যে বির্তক করতে পারতাম একটা সময়ে, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে আগে অন্তত একটু বির্তক করার জায়গা ছিলো, এখন বির্তক করার জায়গা একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সরকার বলেছে, আমরা স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়বো, এদিকে শনি ভর করেছে আমাদের অর্থনীতিতে। সেই শনিটা কি? আমাদের ক্ষমতার দুর্নীতি, দুর্নীতির ক্ষমতা। ক্যাবের এই প্রস্তাবনাগুলোর বাস্তবায়ন কতটা হবে তা আমি জানি না, কিন্তু আমরা বললে তারা বলে আপনাদের তো দুর্নীতি করার ক্ষমতাও নেই। ফলে এ সমস্ত কথা আপনাদের মানায় না। কারণ আপনারা তো ভোটই পান না। আপনারা হয়তো জানেন, ভোটের সঙ্গে কিভাবে ক্ষমতা যুক্ত হয়ে আছে, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে কিভাবে ভোট যুক্ত হয়ে আছে। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্বালানি।

> **‘দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের জ্বালানি খাতে লুণ্ঠনবৃত্তি বন্ধ হয়নি। এই লুণ্ঠনবৃত্তি গত সরকারের আমলে যেমন ছিলো, খাম্বা থাকে তো উৎপাদন নেই, এই লুণ্ঠনবৃত্তি কোনোভাবে ঠেকানো যায়নি। এখন উৎপাদন আছে কিন্তু খাম্বা নেই, এই জায়গায় চলে এসেছে সেই একই লুণ্ঠনবৃত্তির কারণে। আমরা যদি এসব প্রশ্নে নাগরিক আন্দোলন জোরদার না করতে পারি এবং এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে জনগণকে সমৃদ্ধ করতে না পারি, তাহলে এগুলো করে লাভ নেই’**
>
> **রাশেদ খান মেনন,** *সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি*

জ্বালানি ও জীবনযাত্রা কিন্তু সমার্থক। ফলে জ্বালানির সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, এটাকে কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। এজন্যই এটাকে কেন্দ্র করে জনগণকে জিম্মি করা সবচেয়ে সহজ। খাদ্য দিয়ে জনগণকে জিম্মি করা যেমন সহজ যেকোনোভাবে খাদ্য লাগবেই। জ্বালানিও তেমন, জ্বালানি ছাড়া আমরা কোনোভাবেই বাঁচতে পারবো না। এমনকি আমরা যে মোবাইল ব্যবহার করি। এ মোবাইল ব্যবহার করতে প্রতিদিন ২৭ থেকে ৩০ পয়সার বিদ্যুৎ খরচ হয় চার্জের পেছনে। দেশে আঠারো কোটি মোবাইল সেট। এ মোবাইল ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, আমরা বুঝতেই পারি না। এর মধ্যে এক পয়সা করে বাড়লে কত পরিমাণ খরচ চলে আসে। একসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা দিয়ে মহাদেশ গড়ার কথা আমরা শুনেছিলাম। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে জনগণের ওপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বৃহৎ লুটপাটের আয়োজন এখানে করা হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের এই জ্বালানি খাত। ফলে এ খাতের নীতি নিয়ে বির্তক হওয়া দরকার।

এখানে আমরা খুবই দুর্বল অবস্থায় আছি। আলাপ হওয়া দরকার যে, জ্বালানি নীতি কি জনমুখী হবে না মুনাফামুখী অর্থলোভী হবে? জনগণকে জিম্মি করা হবে না সহায়তা করা হবে? এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, আমাদের বলতে হয়, দরকার হলে দুই টাকা বেশি নেন তাও বিদ্যুৎ চাই। যেমন মে দিবস আসছে। মে দিবস নিয়ে আমাদের দাবি ছিলো যে, আট ঘণ্টা কাজ চাই। কিন্তু মজুরিটাকে এমন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে যে, শ্রমিকের জীবন চালানো দায়। এখন শ্রমিকরা নিজেরাই বলে, আট ঘণ্টা

কাজ নয়, আমাদের ওভারটাইমও দেন। মানুষকে জিম্মি করে, তাকে অসহায় করে তার ওপর বোঝাগুলো চাপানোর যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জারি আছে তার বিরুদ্ধে একটা পাল্টা রাজনৈতিক সংগ্রাম আমাদের গড়ে তোলা দরকার।

আপনারা যে লড়াই করছেন বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায়, সেটাকে আমরা রাজনৈতিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সফল হতে পারিনি। ফলে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বাসদের জায়গা থেকে বলছি, আমাদের দায়িত্ব যেটা ছিলো, তা পালন করতে পারিনি। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের নানা ধরনের যেসব গবেষণামূলক কাজ আছে, জনকল্যাণমূলক কাজ আছে তাকে আমরা জনকল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে চাই। সে কারণে আপনাদের কাছে আসা, আপনাদের কাছে জানতে চাওয়া।

আরেকটা বিষয় বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করবো। ২০২১ সালে যে খসড়া জাতীয় সৌরশক্তি পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছিলো, বাংলাদেশে পঁচিশ থেকে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৌর শক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মাত্রায় দেখছি মাত্র দশ শতাংশ। মানে সম্ভাবনা যেটুকু আছে সেটাকে পরিবর্তন করে আনইউজড রাখার পরিকল্পনা। একদিকে অব্যবহৃত ক্যাপাসিটির জন্য ব্যয়ের বোঝা চাপানো, আরেকদিকে আমার যে ক্ষমতা সেটাকে পরিকল্পিতভাবে অক্ষমতায় পরিণত ও রূপান্তরিত করার একটা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ফলে এ দুটোর বিরুদ্ধে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা রাস্তার আন্দোলনে থাকতে চাই। রাজপথের আন্দোলনে জনগণকে যুক্ত করার যে ব্যর্থতা আমাদের আছে সেটাকে বিবেচনায় রেখেই জনগণের কাছে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই। মানুষকে এটাই বোঝাতে হবে। বোঝানোর ক্ষেত্রে আপনাদের যুক্তি আমাদের কাজটা সহজ করে দিচ্ছে এবং আজকে আপনাদের উপস্থাপিত এই যুক্তিগুলো আমাদের সহযোগিতা করবে এই প্রত্যাশাই করি। আবারও এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, ***সঞ্চালক***

ধন্যবাদ রাজেকুজ্জামান রতনকে। এ মুহূর্তে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্সকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য।

জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, ***সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)***

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত সম্মানিত আলোচক, উপস্থাপকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট রাজনীতিকবৃন্দ এবং উপস্থিত প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আলোচনার শুরুতে ক্যাবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটি আয়োজন করার জন্য। আমার বিবেচনায় যারা আমরা এখানে উপস্থিত আছি এই আয়োজনের পরে সুনির্দিষ্টভাবেই আমরা এ বিষয়গুলো বুঝতে পারবো। বিষয়গুলো আপনারা স্পষ্টভাবেই তুলে ধরতে পেরেছেন। এটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওয়া। জ্বালানি বিষয়ক আলোচনা অনেক দিন ধরেই জারি ছিলো। মাঝে হয়তো কম হচ্ছিলো, সেটাকে আপনারা আবার বেগবান করেছেন, এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একজন রাজনৈতিক কর্মী, একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের বক্তব্যটাই আমরা প্রতিধ্বনিত করবো। আর তা হলো, ভোক্তা যেন সঠিক দাম, মাপ ও মানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা পায়। সেজন্য মূল্যহার নির্ধারণ, উৎপাদন, বণ্টন, সঞ্চালন, বিতরণসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহের সকল পর্যায়ে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, সমতা, যৌক্তিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের জন্য আমাদের তো এটাই করতে হবে। সুতরাং আপনারা যে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন তার সঙ্গে আমরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আমাদের জোট বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে শতভাগ ঐক্যমত পোষণ করছি। আর কেবলই ঐকমত্য না, এটা লড়াই করে আদায় ব্যতিরেকে আর কোনো জায়গা নেই।

অনেকেই হয়তো আছেন, আপনারা জানেন যে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা অনেকদিন ধরেই এই লড়াইয়ের কাজটা করছি। যেসব নেতৃবৃন্দ এটা গড়ে তোলার কাজ করেছেন, আমিও সেই আন্দোলনের শুরুর একজন কর্মী ছিলাম এবং এখানে এম এম আকাশ আছেন, তিনি এটার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৯৬-৯৭ সালের দিকে যখন এই আন্দোলন গড়ে

> **‘ যারা জ্বালানি খাতের সরকারি সংস্থাগুলোর দায়িত্বে থাকে, দায়িত্ব পালন শেষ করেই তারা এই খাতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাতে করে তারা যখন দায়িত্বে থাকেন তখন দেশের স্বার্থে কাজ করতে পারেন কিনা, নাকি তার ভবিষৎ নিশ্চিত করার জন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট কোম্পানিকে সুবিধা দিয়ে যান ’**
>
> **লুৎফর রহমান কাকন,** *সংবাদকর্মী, আমাদের সময়*

তুলি তখন আমাদের সামনে কিন্তু এ বিষয়গুলো এত পরিষ্কার ছিলো না। অন্যরা বুঝাতে চলে আসতো। কেমন বুঝাতো সেটা আমাদের বদরুল ইমাম সাহেব বলেছেন, জ্যোতির্ময়ও কিছুটা বলার চেষ্টা করছেন। তারা আমাদের না বুঝিয়ে, আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে কিভাবে আমাদের সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যেতে পারে, সেই চেষ্টাই তখন আমরা দেখেছি। একসময় দেখেছি প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট নিয়ে নানা ঘটনা। মালিকানা আমাদের থাকবে না। তারা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে এ জায়গাগুলোসহ অন্য আরো অনেক কিছু আমরা বুঝতে শিখেছি। এখন আমরা এখানে এসে আরো অনেক কিছু আপনাদের কাছ থেকে পাচ্ছি। আবারও বলছি, শতভাগ ঐক্যমত পোষণ শুধু করছি না, এটার কোনো বিকল্প পথ দেখালে তার বিরুদ্ধেই হবে আমাদের অবস্থান।

সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলন নিয়ে কি হয়েছে বদরুল ইমাম সাহেব বিস্তারিত বলেছেন। ২০০৮ সালে যে মডেল পিএসসি হয়েছিলো গ্যাস রপ্তানির জন্য, আমরা কিন্তু তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। হরতাল পর্যন্ত হয়েছিলো। গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছিলো। র‍্যাব আমাকে পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেছিলো। আজকে এ বিষয়ে একটা ঘটনা বলে রাজনীতির কি অবস্থা তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমাকে অ্যারেস্ট করার পরে র‍্যাবের কর্মকর্তারা জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনারা এ আন্দোলন করছেন? আমি বললাম হরতাল করছি জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় মডেল পিএসসি বাতিলের জন্য। তাদের একজন বললেন, আমাদের যে সম্পদ এটা তো যেকোনোভাবে তুলতে হবে। এটা কি কাজ করছেন আপনারা? তিনি বলতে পারতেন, আপনারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছেন, এর জন্য গ্রেফতার করছি, কিন্তু সে কথা বললেন না। কে এই ভদ্রলোককে জানি না, ছবি আছে। কেউ আগ্রহী হলে ছবি দেখে তাকে খুঁজে বের করতে পারেন। তবে তিনি যে আর্গুমেন্ট আমার সঙ্গে করলেন, এটা তাজ্জব বনে যাওয়ার মতো। একটা পলিটিকাল পার্টির ইভেন্ট হচ্ছে, পুলিশ সেখানে পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করছে? চিন্তা করতে পারেন? তখনো এই সরকারই ক্ষমতায় ছিলো। তাদের একজন মন্ত্রীর সঙ্গে পরে যখন আমার কথা হলো বললাম, ভাই আপনারা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? একজন র‍্যাবের কর্মকতা সে আমার সঙ্গে রাজনৈতিক বির্তক করছে। রাষ্ট্রটাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন চিন্তা করা যায়?

যাই হোক, গ্যাস সম্পদ উত্তোলনের প্রশ্নে আবারো আসি। প্রয়োজনে আমরা প্রযুক্তি নিয়ে আসতে পারি, এটা এম এম আকাশের আলোচনার শুরুতে এসেছিলো। সে প্রসঙ্গে বলতে চাই, আমরা পদ্মাসেতুসহ অনেক কিছুই তো করলাম। তাতে দেখেছি, আমরা বিদেশি বিশেষজ্ঞ আনতে পারি, মেশিনারি আনতে পারি, টাকা খরচ করে ভাড়া দিয়ে আনতে পারি। কিন্তু আমদানি, উত্তোলন, উৎপাদন সবখানেই শতভাগ দেশীয় মালিকানা নিশ্চিত করে বাইরের প্রযুক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আনতে হবে। কিন্তু এ কথাটা কার কাছে বলবো, জ্বালানি মন্ত্রণালয় আছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি এ জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের লোকজন সাধারণত বহুজাতিক কোম্পানি আর বিদেশি কোম্পানির পিআরের কাজ করে। জনস্বার্থের কোনো ভূমিকা তারা পালন করে না। ক্যাবের দীর্ঘ আলোচনায় কিন্তু এ কথাগুলো টেকনিকালি বলা আছে। সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান ও আমলাদের রেখে কি এই সংস্কারের কাজটা করতে পারবেন? পারা যাবে না। হাত দিতে হবে সেখানে।

আরেকটা ঘটনা বলতে চাই। সম্ভবত আমি যদি হিসাবে ভুল না করি ২০১৪ সালে ক্যাব একটা সেমিনার আয়োজন করেছিলো সুন্দরবনের ওপর। সেখানে এম এম আকাশ মডারেটরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাতে দুটো প্যানেল আলোচনা হয়েছিলো এ বিষয়ে যে, সুন্দরবনে বিদ্যুৎকেন্দ্র করা ঠিক কিনা? তার ঠিক কিছুদিন আগে এখন যিনি সরকার প্রধান তার সঙ্গে আমাদের মিটিং ছিলো। প্রসঙ্গক্রমে উনি বললেন, সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি তাকে নিজে বলেছিলাম খাবারে যাওয়ার আগে, কয়লাভিত্তিক করলে কি হবে এখানে সে তর্কের দরকার নাই। আমাদের ক্যাব এরকম একটা প্যানেল বিতর্কের আয়োজন করছে এখানে আপনি প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিন, অন্তত জানাবোঝার কাজটা হোক। ফলাফল কি হলো শুনবেন, তিনি তখন বর্তমানে মন্ত্রী এমন একজনকে ডেকে নিয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, জানো উনি কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ বিশেষজ্ঞ, পরিবেশের ব্যাপারে উনি ডক্টরেট। এই হচ্ছে তাদের জ্ঞানের পরিধি। আমরা তো পত্রিকায় এও দেখেছি উপদেষ্টারা বলেছেন, তারা সুন্দরবন বানিয়ে দেবেন। এই হচ্ছে যাদের ক্ষমতায়ন, যাদের কাছে আমরা আশা করছি।

সর্বশেষ আরো একটা উদাহরণ দেই। এটাও একটা টেলিভিশন প্রোগ্রামের, ডিবিসি চ্যানেল। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ ছিলেন। ড. আইনুন নিশাত স্যার আর আমি ছিলাম। আমি বললাম চলেন ডিবেট করি। সুন্দরবনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে লাভ হবে না ক্ষতি হবে? উনি ওপেন চ্যালেঞ্জ করলেন। টকশো থেকে বেরিয়ে পরবর্তীতে ফোন করে আমাদের সুন্দরবনের কমিটির এম এ মতিন, সুলতানা আপার সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের ১৩টি ডকুমেন্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে আমরা বললাম উন্মুক্ত ডিবেট হোক। যে স্বচ্ছতার কথা বলছেন, আসুন আলোচনা করে জনগণ ঠিক করুক। ওইখানে রাজি হলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত ডিবেটটা হয়নি। এরপরে একাধিকবার সুলতানা কামালের সই করা চিঠি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছিলো। ব্যক্তিগতভাবে একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা একমত হবার পরেও কেন আলোচনা হলো না। তখন বললো ভাই, সবই প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু জনৈক উপদেষ্টা বললেন, সুন্দরবন রক্ষা কমিটি আর জাতীয় কমিটি, জাস্ট ইগনোর দেম। এই

তো আমার ক্ষমতার কাঠামো।

তাহলে এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে জনস্বার্থে যদি কিছু করতে হয়ে তাহলে কার কাছে যেতে হবে। এখানে যত কথাই বলি আজকের ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে আমরা কিন্তু জবাবদিহিতা পাবো না। সুতরাং আজকের রাজনীতিবিদদের মধ্যে আপনারা যদি প্রত্যাশা করতে চান, তাহলে সে রাজনীতিবিদদের ওপর প্রত্যাশা করতে হবে যারা ক্ষমতার কাঠামোকে অস্বীকার করে জনগণের পক্ষে দৃঢ়ভাবে কাজ করছেন। হয়তো আমাদের কণ্ঠ এই ইস্যুতে নানা কারণে শিথিল হয়েছে। এই শিথিলতা থাকবে না। আমরা সমুদ্রের গ্যাস অনুসন্ধান এখনই চাই, দ্রুত চাই, তবে শতভাগ মালিকানা চাই। দরপত্র আহ্বান করে, বিনা দরপত্রে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা চাই না। আপনি কম পয়সায় ট্রানজিট দিচ্ছেন ভারতকে, জাপানকে দিচ্ছেন মাতারবাড়ির অনান্য কাজ, আর আমেরিকাকে দেবেন সমুদ্রের গ্যাস তোলার কাজ, যেখানে আমার স্বার্থ থাকবে না, এটা আমরা হতে দেবো না। সুতরাং এ সংগ্রামে আমি মনে করি আমাদের প্রধান শক্তি হবে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ। আর আজ ক্যাব যেরকম সুনির্দিষ্টভাবে বিশেজ্ঞদের মধ্য দিয়ে নানা তথ্য উপাত্ত তুলে ধরলো, সেটাই হবে আমাদের অন্যতম অস্ত্র। এই অস্ত্র নিয়ে আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, জাতীয় সম্পদ রক্ষা আন্দোলনকে অগ্রসর করবো এবং অবশ্যই জনস্বার্থ আমার নিশ্চিত করবো।

ধন্যবাদ সবাইকে।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

ধন্যবাদ রুহিন হোসেন প্রিন্সকে। এখন আমি অনুরোধ করছি, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাবেক শিল্পমন্ত্রী এবং সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব দিলীপ বড়ুয়াকে তার মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য।

জনাব দিলীপ বড়ুয়া

সাবেক শিল্পমন্ত্রী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল

আজকের এ আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আলোচনা সভার প্রধান আলোচক, আলোচকবৃন্দ এবং যারা জ্বালানি খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ করেছেন, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আপনারদের সবাইকে আমি উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আমাকে এ আলোচনা সভায় কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু যখন সরকার গঠন করছিলেন তখন তিনি তেল সম্পদকে অর্থাৎ জ্বালানিকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের কোনো তেল কোম্পানি ছিলো না। তখন শেল কোম্পানির মতো কোম্পানিগুলোকে তিনি জাতীয়করণ করেছিলেন এবং একশোভাগ জনগণের মালিকানা নিয়ে এসেছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় আমাদের ১৪ দলীয় জোটে যখন আমরা ২৩ দফা প্রণয়ন করেছি সেখানে কিন্তু এ বিষয়গুলো উল্লেখ ছিলো। জাতীয় সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তেল সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করা হবে, সমুদ্র থেকে কিভাবে উত্তোলন করা হবে, এই বিষয়গুলো সেখানে পরিষ্কার ছিলো। কিন্তু হচ্ছিলো কি দেখেন, আমি যখন শিল্পমন্ত্রী ছিলাম তখন দেখেছিলাম কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিতে আমাদের স্থানীয় দামে গ্যাস সাপ্লাই দিতে হতো। কিন্তু তাদের থেকে আমাদের সার কিনতে হতো, সিঙ্গাপুরে যে দর সেই বিদেশি দরে। আবার কোনো কারণে যখন গ্যাস সাপ্লাই কম থাকতো, তখন আমাদের কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে সাপ্লাই দিতে হতো। তারপর যখন কোনো কিছু বিদেশ থেকে আমদানি করতাম প্রথমে সাপ্লাই দিতে হতো কর্ণফুলীকে, পরে আমরা দিতাম দেশীয় কোম্পানিকে।

আবার আরেকটা বিষয় হলো, আমাদের শিল্পপতিরা বলতেন, আমাদের ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি রাখার দরকার নাই। এগুলাকে বন্ধ করে দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারি। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করলে খরচ বৃদ্ধি

> **‘ক্যাব থেকে সবচেয়ে বেশি যে আইনটিকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, আদালতে যে আইনটি আমরা বারবার উপস্থাপন করেছি, সেটা হলো ২০০৩-এর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন। কেন আমরা এটা করেছি? আমরা ক্যাব থেকে মনে করছি, এই বিইআরসি নামক প্রতিষ্ঠানটিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শক্তিশালী করতে না পারবো, এই প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানকে স্বাবলম্বী করে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারবে না’**
>
> **ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া,** *আইন উপদেষ্টা, ক্যাব*

পাবে কৃষকদের ওপর চাপ পড়বে উৎপাদনের ক্ষেত্রে, এটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমদানির কমিশন ভোগ করা। এ নিয়ে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া বিবাদ হয়েছে। তখন জ্বালানি খাতে ছিলেন আবুল কালাম আজাদ সাহেব, আর ছিলেন মাননীয় উপদেষ্টা। তারা তাদেরই পক্ষ নিতেন। তখন আমি রাষ্ট্রের দায়িত্বে ছিলাম বলে বিষয়গুলো জানি।

এ বিষয়ে আরো কিছু তথ্য যোগ করি। চিনি কারখানায় শিল্পমন্ত্রী হিসেবে গিয়েছিলাম। তাদেরকে বলেছিলাম, গরিব মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে চিনির দাম ৫০ টাকার মধ্যে রাখতে হবে। কিন্তু তখন যারা আবার চিনি আমদানি করতে চায় সেসব কোম্পানির আবার এতে সাঁয় ছিলো না। তারা সরকারকে বলেছে। আমিও তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি যে, চিনির দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। আমার আমলে সেটা করেছিও। তখন কিন্তু ৫০ টাকার উপরে চিনির দাম ওঠেনি। লবণের ক্ষেত্রেও কিছু ব্যবসায়ী আছে লবণ উৎপাদনের সময় হলে তারা চিৎকার করে বলে, এই লবণ দিয়ে হবে না। এইসব লবণে ময়লা আছে। এই লবণ পরিষ্কার করতে হবে। মূল উদ্দেশ্য হলো মনোপলি আর ম্যানিপুলেশন। এখন সরকার আমরা যে জোটের, আমাদেরই সরকার। আমরা এ জোটের দলের সঙ্গে ক্ষমতায় আছি, ফলে আমরা এ দায় থেকে অব্যাহতি পাচ্ছি না। এ সরকার বঙ্গবন্ধুর নীতির কথা বলে। কিন্তু গ্যাস এর ক্ষেত্রে, জ্বালানির ক্ষেত্রে তারা বঙ্গবন্ধুর নীতির ব্যাপারে পুরোপুরি উদাস। তার চিন্তা চেতনার পরিপন্থী কাজ করছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে বাইরে থেকে লোক ধরে ধরে এনেছে, তাদের অভিজ্ঞতা আছে কি নাই তা দেখেনি। তাদের দিতে দিতে অনেক বেশি খরচ হয়ে গেলো এবং সরকারের বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। সরকার তখন যা করেছে সব অ্যাড-হক ভিত্তিতে। দীর্ঘমেয়াদি জায়গা থেকে ভাবেনি। গ্যাস যদি না আসে, ডিজেল যদি না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে, এ জিনিসগুলো কিন্তু সরকারের পলিসি মেকাররা চিন্তা করেনি। তারা চিন্তা করেছে রাতারাতি ধুন্ধুমার করে ফেলতে। আমাদের দেশে অনেকেই এনার্জি বিক্রির টাকায় রাতারাতি ধনী হয়ে গিয়েছে। তারা জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে সংকটের সময় বিদেশ থেকে গ্যাস নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ সেই গ্যাস পায়নি। গ্যাস যে জাহাজের মাধ্যমে এসেছে তার পাইপের মাপ আমাদের যে জাহাজে খালাস করা হবে তার পাইপের সঙ্গে মেলেনি। যার ফলে এভাবে যা হয়েছে, তা হলো লুটপাট।

আমরা অনেকেই আগের সরকারের সমালোচনা করি। কিন্তু আমরা নিজেরাই তো সৎ হতে পারিনি। আমরা তো লুটপাটকে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি এবং তার প্রভাব জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়ে তো জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে সুরক্ষা করা যাবে না। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তরা রক্ষণশীল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং এখানে লুটেরা ধনীকশ্রেণী সৃষ্টি করে। তারা আগে বলতো সরকারি ব্যাংকগুলোতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লুটপাট হয়। এখন তো বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে পুকুরচুরি হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংকে কি হচ্ছে বা বিভিন্ন ব্যাংকগুলোতে কি হচ্ছে?

মূল কথা হচ্ছে আমাদের দেশে বর্তমানে লুটেরা ধনিক শ্রেণী, নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগের তুলনায় দেখেন এ আমলে দুর্নীতি আরো ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষতে সেটা আরো উজ্জ্বল হবে। তাই আমাদের একমাত্র কথা, জনগণের মালিকানা সৃষ্টি করতে হলে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে হবে না। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের মালিকানাকে বাস্তবায়ন করে, সেই রাজনৈতিক আদর্শটাকে সমুন্নত না রাখলে তাতে হয়তো এরকম আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এর ফলাফলটা কিছু হবে না। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কেউ ব্যক্তিগতভাবে হয়তো লাভবান হতে পারি। কিন্তু জনগণ যেমন আছে তেমনই থাকবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে আপনারা যেটা তুলে ধরেছেন আমরা এটার সঙ্গে সাম্যবাদি দল শতভাগ একমত। এটার জন্য আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প কিছু নেই বলে আমরা মনে করছি। এ আন্দোলন সংগ্রাম হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ এবং এর সঙ্গে জনগণকে যত বেশি সম্পৃক্ত করতে পারবো, বুদ্ধিজীবী ও স্টেকহোল্ডারদের যত বেশি সম্পৃক্ত করতে পারবো, ততোই আমরা লাভবান হবো এবং চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে যেতে পারবো। এ কথা বলে আপনাদের মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ সকলকে।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, ***সঞ্চালক***

ধন্যবাদ জনাব দিলীপ বড়ুয়াকে। এখন আমরা শুনবো বিশেষ অতিথি জনাব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীর আলোচনা। এমপি মহোদয়, আপনার কথা শুনতে চাই।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, ***সংসদ সদস্য***

ক্যাবকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমাদের অনেক রাজনীতিবিদ এখানে আছেন, জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা আছেন, সকলকে ধন্যবাদ। ক্যাবের সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক ছিলো। প্রথম দিকে বাবা যখন মানবাধিকার বিষয়ে ক্যাবের সঙ্গে কাজ করতেন তখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম। তাই আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে খুব স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছি।

জ্বালানি বিষয়ে খুব বেশি কিছু আমি জানি না। তবে এ খাতে যে অরাজকতা চলছে, অশুভ ছায়া পড়েছে এটা বোঝার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত লাগে না। ব্যাংক ও জ্বালানি, এ দুটো খাত সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকভাবে অব্যবস্থাপনার নমুনা হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। কেন হচ্ছে এটার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। একটা তো

আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা আছে। প্রত্যেক সফলতাই আসলে রাজনীতিবিদদের সাফল্য, প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই দিনশেষে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা। কারণ একটা ব্যবসাতন্ত্র, একটা পলিটিকাল বিলিয়নার্স ক্লাব, আমলাতন্ত্র, তারা সবাই মিলে এই সেক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে।

রাজনীতিবিদদের ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ সবসময়ই ছিলো। তবে এখন যেটা হচ্ছে, অনেক রাজনীতিবিদ নিজেরাই ব্যবসায়ী হয়ে জ্বালানি, ব্যাংক, এই সেক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। যারা পলিসি বানাচ্ছেন তারা নিজেদের জন্যই নিজেরা পলিসি বানাচ্ছেন এবং একই প্রভাব আমলাতন্ত্রের মধ্যেও আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অনেক শীর্ষ আমলা, তাদের স্বজন, বন্ধুবান্ধব দিয়ে কোম্পানি তৈরি করে মিনিস্ট্রির ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করছেন। এটা দুঃখজনক। রাজনীতিবিদ ও ব্যুরোক্রেসির আলাদা আলাদা দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু এখন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। পক্ষপাতের বিষয়টা চরম বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ফলে যখনই কোনো পলিসি করা হচ্ছে, যখনই কোনো আইন করা হচ্ছে, যখনই কোনো নীতিমালা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে দেশের স্বার্থ যতটা না নিশ্চিত হচ্ছে, গুটিকয়েক গোষ্ঠী বা কর্পোরেট গ্রুপের স্বার্থ বেশি রক্ষা হচ্ছে। সেকারণে সম্পদের বৈষম্য বাড়ছে, গুটিকয়েকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং এই উত্থানের প্রবণতাটা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে।

আমাদের সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে সম্পদের সুষম বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। এটা আমরা প্রতিনিয়ত ভঙ্গ করছি। এবং আমরা প্রায়ই ভুলে যাই আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে, জনগণ রাষ্ট্রের মালিক, রাষ্ট্রের সম্পত্তির মালিক। কিভাবে এটা নিয়ন্ত্রিত হবে এটাও সংবিধান বলছে। নির্বাচিত সরকার দিয়েই জনগণের মালিকানা প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ আমরা রাজনীতিবিদ বাদ দিয়ে কিছু করতে পারবো না, নির্বাচিত প্রতিনিধি বাদ দিয়ে কিছু করতে পারবো না, এটা কিন্তু সংবিধানেই বলে দিয়েছে। সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে জ্বালানি খাতে কার্যকর অংশীদারি ও ন্যায়বিচার কখনোই নিশ্চিত করা যায়নি। আগে যে প্রথাটা ছিলো, একটা মিটিং করা, কিছু আলোচনা করা এবং সরকার যে সিদ্ধান্ত নিতো কমিশনে সে সিদ্ধান্তই চাপিয়ে দেওয়া, সেটাই হয়ে আসছে। এখন আবার অনেকে বলছেন কমিশনই নাকি বাদ পড়ে যাবে। তাহলে আরো ভয়ঙ্কর বিষয় হবে।

কমিশনগুলো করা হয় কখন বা কর্পোরেশন কখন করা হয়? যখন ট্রাডিশনাল মিনিস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচারে কোনো সীমা দেওয়া যায় না, তখন সেটা কর্পোরেশন কমিশন করা হয়, যার একটা স্বাধীন সত্তা থাকবে। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রবণতা হলো, প্রায় সব সেক্টরে মন্ত্রণালয়গুলো কমিশনগুলোকে গ্রাস করে ফেলছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকও তার বাইরে নয়। কমিশনগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং কমিশনের কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনভাবে বিশেষজ্ঞদের বসার সুযোগ আছে, যেটা মন্ত্রণালয়ের নেই, এটার বাস্তবতা বুঝতে হবে।

আমি আপনাদের ১৩ দফাগুলো দেখলাম। এখানে মেনন ভাইসহ অনেকেই আছেন। সংসদে আমরা এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই উত্থাপন করতেই পারি। আরো কিছু ক্যাটাগরি থাকলে ভালো হয়। যেমন কোন কোন আইন প্রতিযোগিতার প্রতিবন্ধক, এটার একটা তালিকা দিলে ভালো হতো।

আর যেটি খুবই দুঃখজনক, একটা আইন। দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ আইন। আমি এমপি হওয়ার পরে দুইবার এ আইন সংসদে এসেছে। এটা আসলে রদ করা দরকার। এখন হয়তো রদের প্রশ্ন আসছে। একটা সময় রিনিউ না করলেই হতো। আইনটি ভয়ঙ্কর। এ আইনে বলা আছে, এই আইনের অধীনে যা কিছু করা হবে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না, কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না! আমাদের ক্যাপাসিটি চার্জ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এটা যদি

‘ক্যাপাসিটি চার্জের নামে যেটা বলা হচ্ছে, সেটা আসলে কম্পেনসেশন ফর করাপশন। একজন দুর্নীতি করবে আর বাকি মানুষজন তার ক্ষতিপূরণ দেবে এবং এর দায় ভোগ করবে। আমাদের বাংলাদেশে চার কোটি দশ লাখ পরিবার আছে। তার মধ্যে ৯৫ শতাংশ ধরলে, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবার আছে প্রায় চার কোটি পরিবার। তারা কিন্তু এ জ্বালানির দামের বোঝাটা বহন করছে। আর জ্বালানির দামের মজাটা ভোগ করছে হয়তো দশ লাখ পরিবার এবং তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য আবার দেশের বাইরে থাকে। ফলে দেশের কি হলো না হলো এতে তাদের কিছু যায় আসে না’

রাজেকুজ্জামান রতন

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

আট লাখ কোটি টাকাও হয় তাও আপনি মামলা করতে পারবেন না। এ টাকা দিতে হবে কাকে? জনগণকে। সরকার আসবে সরকার চলে যাবে কিন্তু চুক্তির দায়, এটা তো ভবিষৎ সরকার, সংসদ ও দেশকে বহন করতে হবে। সে জিনিসগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্নও করা যাবে না। আবার এ আইনে বলা হয়েছে, কোনো টেন্ডার লাগবে না। এ আইন অনুযায়ী সরকার বা মন্ত্রণালয় যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে এবং কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। এবং সে আইনটা সরকারের জন্য অনেকটা ক্ষতিকরও বলা যায়। কারণ এতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, যেহেতু দেশে চরম বিদ্যুৎ জ্বালানি ঘাটতি বিদ্যমান তাই এ আইনটি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এটা ২০১০ সালে বলা হয়েছিলো। এখন ২০২২ সালে যখন এ আইন রিনিউ করা হচ্ছে তখনো বলা হলো, দেশে চরম বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি বিদ্যমান। তাহলে কি বিগত ১২ বছরে এ সেক্টরে কোনো উন্নতি হয়নি। সরকার নিজেই তো আইন করে নিজের সব কাজকে বাতিল করে দিচ্ছে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত এখন এ আইনের মেয়াদ আছে। তার আগেই রদ করে দেয় ভালো। আর এটার যেন রিনিউ না হয়।

আমাদের সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে ক্লাইমেট জাস্টিস করতে হবে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য। ইন্টার জেনারেশনাল জাস্টিস ও ইকুইটির এই ধারণাটা সংবিধানে চলে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্র কি তা বাস্তবায়নে প্রস্তুত? আমরা তো দেখি, রাজেকুজ্জামান রতন ভাই যেমনটা বলেছেন, সেভাবেই নীতিগুলো করা হয়েছে যাতে করে আমাদের সবকিছু বিদেশ থেকে নিয়ে আসতে হবে, যাতে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে। জনগণকে আসলে ভোক্তা থেকে বাদ দিয়ে ব্যবসার সাবজেক্ট বা মার্কেট বানিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা হচ্ছে। আমি মনে করি, এ বিষয়গুলো তীব্রভাবে মেরামতের দাবিদার। জনগণের অংশগ্রহণ নিয়ে এবং জনগণের সম্মতি নিয়ে সেটা সংসদ থেকে হওয়া উচিত। আর সংসদকেও আমরা সব জায়গায় দায়বদ্ধ করতে পারি না। আমরা চিল্লাচিল্লি করতে পারি, হৈচৈ করতে পারি, সেন্সেশন ক্রিয়েট করতে পারি, কিন্তু মেজরিটি ছাড়া তো আমরা পার্লামেন্টে দাবি আদায় করতে পারি না।

পার্লামেন্টের বাইরে অবশ্যই ক্যাবের মতো সংগঠন এবং আরো যে সংস্থাগুলো আছে তারা যদি নিয়মিত তাদের ভয়েজ রেইজ করে যে, এই এনার্জি সেক্টরটা ওপেন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট হওয়া দরকার কারণ এটা সরাসরি ১৬ কোটি লোককে আক্রান্ত করে। জ্বালানি বৈষম্য দেশে আছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একটা অঞ্চলের মানুষ গ্যাস পায়, আরেক অঞ্চলের মানুষ পায় না। যারা পায় না তাদের তো অন্য কোনো দিক থেকে পুষিয়ে দিতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলো করতে হবে।

এখন আসেন এই যে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জির কথা বলছি, এর টাকাটা কোথা থেকে আসবে। সরকার এটার জোগান দিতে পারবে কিনা? সরকার যদি এটার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে কি এটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি দেবে, যারা বেশি দূষণ ঘটাচ্ছে তারা কি দেবে? এটা নিয়ে সারা বিশ্বেই আলাপ আছে। কিন্তু আমরা সেই সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হচ্ছি কিনা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কপসহ বিভিন্ন যে সম্মেলনগুলো হয়, সেখানে আমরা আমাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারি না। আমাদের যে পরিমাণ দুর্গত অবস্থা, সে তুলনায় প্রাপ্তি একেবারেই সীমিত। কিন্তু এরকম প্রতিটি আয়োজনে বাংলাদেশের কার্যকরী অংশগ্রহণ থাকতে হবে, আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরতে হবে এবং প্রাপ্য আদায় করে ফিরতে হবে। এজন্য এখন থেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা করতে হলে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সুশীল সমাজ, রাজনীতিক, বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডারদের সম্পর্কটা দৃঢ় হওয়া দরকার। এটা করলে আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে পারি। তবে অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানোর সক্ষমতাও তৈরি করতে পারতে হবে। অর্থ পেলে আমরা তা ব্যবহারে সক্ষম কিনা আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে তা এনশিউর করতে হবে।

আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আবার ফিরে যাই বিশেষ বিধান আইনের বিষয়ে। এ আইন দিয়েই তো কুইক রেন্টাল করা হলো। এটার তো ১৬ বছর হয়ে গেছে। আরো ১৬ বছর চলতে পারে। এটা তো তাহলে কুইক থাকলো না। এটা তো গলার ফাঁস হয়ে গেলো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো ক্যাপাসিটি চার্জ। আর তো বেশি কিছু লাগে না। বাংলাদেশ দেউলিয়া হওয়ার জন্য আর কোনো খাত লাগবে না। এই জ্বালানি খাতই তো যথেষ্ট। যে পরিমাণ টাকা আমরা এখানে অপচয় করেছি, সে পরিমাণ টাকা খাদ্যে ব্যয় করা হলে পুরো জাতির পুষ্টিমান বেড়ে যেতো, শিক্ষায় দিলে শিক্ষা ও দক্ষতার হার বেড়ে যেতো। যদি রিনিউয়েবল এনার্জিতে দিতাম, তাহলে এতদিনে আমাদের হয়তো বিদ্যুৎ সমস্যার অনেকখানির স্থায়ী সমাধান পেয়ে যেতাম। এখন আমাদের এই রিনিউয়েবল এনার্জিকে ঘিরেই সব দাবি করা দরকার। সংবিধানে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জিকে ঘিরে একটা অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে পারি কিনা, এদিকে নজর দেয়া দরকার। এটা এখন একটা বিশাল খাত এবং সংবিধানে এর একটা নির্দেশনা দরকার।

আপনাদের সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। সরকারের উচিৎ এটা আমলে নেয়া। এখানে অনেক বিষয়ই আছে, যার সঙ্গে সরকারের তেমন কোনো বিরোধ নেই। সেগুলো তো প্রথমে স্বীকার করে নিতে পারে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, যেসব বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই, যা গ্রহণ করলে সরকারের কোনো ক্ষতি হবে না, সেসব বিষয়ে ওঠা দাবিও মন্ত্রণালয় আমলে নিতে চায় না। এখান থেকে বেরিয়ে জনগণের স্বার্থের পক্ষের বিষয়গুলোকে গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, ***সঞ্চালক***

ধন্যবাদ ব্যারিস্টার শামীম হায়দার

পাটোয়ারীকে। একজন সংসদ সদস্য যখন কোনো বিষয় আমলে নেয়, সেটি অবশ্যই অন্য ধাপে উত্তীর্ণ হয়। বিশেষত তিনি যখন আত্মসমালোচনা করেন তখন সেটি আরো এগিয়ে যায়। এখন আমরা শুনবো মুখ্য আলোচক ও সম্মানিত প্রধান অতিথির আলোচনা। এখন কথা বলবেন বরেণ্য রাজনীতিবিদ জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি মহোদয়।

রাশেদ খান মেনন, *সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি*

ধন্যবাদ, সম্মানিত সঞ্চালককে এবং ধন্যবাদ ক্যাবকে আজকের এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। আর আমাকে যে মুখ্য আলোচক করা হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ। আসলে আলোচনার বিষয়বস্তু এর আগেই আমাকে জানানো হয়েছিলো, যে কারণে আমার আসার সুযোগও হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনা করার মতো যোগ্যতা বা দক্ষতা আমার নেই। সেটা স্বীকার করেই চেষ্টা করছি আমার মতামত ও বক্তব্য তুলে ধরার।

আমি প্রথমেই বলবো যে প্রস্তাবনাটা আপনারা উপস্থাপন করেছেন, এর মধ্য দিয়ে সবকিছুই কিন্তু স্পষ্ট হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে বা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা একেবারে কোনো দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি না, তা কিন্তু নয়। তবে খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সেটাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিতে যেতে পারিনি। ক্যাব সেই জায়গায় ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। তাই ক্যাবকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন, তার মধ্যে অধ্যাপক বদরুল ইমাম এবং এম এম আকাশ, দুজনেই জানেন যে নব্বই দশকে আমরা এরকম গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। নাগরিক আন্দোলন করেছিলাম এবং তার মধ্য দিয়ে সাফল্যও এসেছে। একটা প্রধান সাফল্য ছিলো, আমরা আমাদের দেশের গ্যাস পাচার বা রপ্তানি ঠেকাতে পেরেছিলাম। তখন বলা হতো যে, বাংলাদেশ গ্যাসের সাগরে ভাসছে। যদি আপনাদের স্মরণ থাকে, সেদিন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরাও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে এত গ্যাস রয়েছে, তাহলে কেন তা রপ্তানি করা যাবে না? সেদিনও এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিলো এবং আমরা সে সময় কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম তৎকালীন প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী এবং পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই জায়গায় দৃঢ় ভূমিকা রেখেছিলেন আর বলেছিলেন পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গ্যাস রিজার্ভ না রেখে গ্যাস রপ্তানি করবো না এবং তিনি দাবি করেন যে, সেজন্য তাকে রাজনৈতিক মূল্যও দিতে হয়েছে নির্বাচনে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

তখন সামগ্রিকভাবে জনগণের মধ্যে বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনার মধ্যে ছিলো এবং জনগণের এ বিষয়ক ভাবনা গুরুত্বও পেয়েছিলো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, আমরা যখন নাগরিক আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে রাজনীতি ও দলীয়করণের মধ্যে নিয়ে যাই তখন কিন্তু সেটা আর থাকে না। পরবর্তীকালে যখন আমরা রামপাল নিয়ে আন্দোলন করছিলাম সেই সময়টায় এসে যখন রাজনৈতিক

> **‘ রাজনীতিবিদদের ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ সবসময়ই ছিলো। তবে এখন যেটা হচ্ছে, অনেক রাজনীতিবিদ নিজেরাই ব্যবসায়ী হয়ে জ্বালানি, ব্যাংক, এই সেক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। যারা পলিসি বানাচ্ছেন তারা নিজেদের জন্যই নিজেরা পলিসি বানাচ্ছেন এবং একই প্রভাব আমলাতন্ত্রের মধ্যেও আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অনেক শীর্ষ আমলা, তাদের স্বজন, বন্ধুবান্ধব দিয়ে কোম্পানি তৈরি করে মিনিস্ট্রির ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করছেন। এটা দুঃখজনক। রাজনীতিবিদ ও ব্যুরোক্রেসির আলাদা আলাদা দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু এখন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। পক্ষপাতের বিষয়টা চরম বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ফলে যখনই কোনো পলিসি করা হচ্ছে, যখনই কোনো আইন করা হচ্ছে, যখনই কোনো নীতিমালা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে দেশের স্বার্থ যতটা না নিশ্চিত হচ্ছে, গুটিকয়েক গোষ্ঠী বা কর্পোরেট গ্রুপের স্বার্থ বেশি রক্ষা হচ্ছে। সেকারণে সম্পদের বৈষম্য বাড়ছে, গুটিকয়েকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং এই উত্থানের প্রবণতাটা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে ’**
>
> **ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী,** *সংসদ সদস্য*

দ্বিধাবিভক্তি সামনে চলে এলো, তখন সেই আন্দোলনের ধার কমে গেলো। কিন্তু আজকে এটা স্পষ্ট যে, সেই নাগরিক আন্দোলন কতটা জরুরি ছিলো, ক্যাবের এই আলোচনায় এটা কিন্তু স্পষ্ট হয়েই বেরিয়ে আসলো।

এখানে আলোচনায় যে প্রধান প্রশ্নগুলো এসেছে, তার একটি হচ্ছে জ্বালানির মালিকানা। এটা আমাদের সংবিধান নির্ধারিত করে দিয়েছে, জনগণ তার প্রতিনিধির মাধ্যমে এর মালিকানায় থাকবে। কিন্তু আমাদের সংসদে সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে কিনা? জ্বালানির অধিকারটি জনগণ প্রয়োগ করতে পারছে কিনা, এই প্রশ্নটি এখানে প্রধানভাবে এসেছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এসেছে যে, চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমরা যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করলাম, সেই পদ্ধতি আমরা চালিয়ে যেতে পারি কিনা। একটা সুন্দর উদাহরণ উঠে এসেছে যে, আগে অবস্থা ছিলো, খাম্বা আছে উৎপাদন নাই, এখন উৎপাদন আছে খাম্বা নাই। এই কথাটা এত গুরুত্বপূর্ণ ও এত অর্থবহ যে, এটা আমাদের জ্বালানি খাতের সামগ্রিক চিত্রকে প্রতিফলিত করছে। আমাদের উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু সেই উৎপাদন অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। যখন সেই উৎপাদন অব্যবহৃত থাকছে, তখনও কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে, ভারতের কোম্পানি আদানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছি। সেখান থেকেও যদি কোনো কারণে বিদ্যুৎ আমদানি না করা লাগে, সেখানেও কিন্তু ক্যাপাসিটি চার্জের চাপ। তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা আমাকে করতে হচ্ছে।

তৃতীয় যে প্রশ্নটা এসেছে, জ্বালানি খাতে আমাদের আইনগত অধিকারটি রক্ষিত হচ্ছে কিনা। কারণ আমরা দেখেছি যে ২০১০ সালে যে আইনটি আসলো আমাদের বিদ্যুৎ সংকট সামাল দেয়ার জন্য, সে আইনের নাম দেয়া হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন। এটি একটি ঘৃণিত আইন। কারণ আমাদের রাজনীতিতে এই 'ইনডেমনিটি' নিয়ে এত কথা হয়েছে, এটা একটা ঘৃণিত শব্দ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু দেখা গেলো বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এসে আমরা অবলীলায় এ আইনটি তৈরি করে দিলাম। যে আইনের অধীনে উৎপাদন, বিতরণ, ব্যবহার ও তার সব ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করতে পারবে না। সেটা সর্বশেষ ২০২২-এ এসে আবার নতুন করে সংশোধন করে নবায়ন করা হয়। চতুর্থ যে প্রশ্নটা এসেছে, আমরা কি করলাম, সমস্ত জ্বালানি খাতটাকে আমদানিনির্ভর করে দিলাম। এখন আমরা এলএনজি আমদানি করছি। বাপেক্সের যে ক্ষমতায়নের দাবি আমরা করতাম, সেটাকে উপেক্ষা করে বাপেক্সকে বাদ দিয়ে আমরা গ্যাস উত্তোলন না করে জ্বালানিকে আমদানির উপরে নির্ভরশীল করলাম। যে কারণে এখন আমাদের গ্যাসের জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে ১ টাকার জায়গায় ৮৩ টাকা।

এসব বিষয় নিয়ে আমরা যে একেবারে নীরব, তা নয়। এ বিষয়গুলো আমরা কম বেশি সংসদেও বলেছি। সংসদে যখন এরকম জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়, সে কথাগুলো হয়তো পত্রপত্রিকায় কম প্রকাশিত হয়। যখন আমরা কোনো চটুল কথা বলি, সেটাই বেশি প্রচারিত হয়। সংসদে আমরা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপিও বলেছেন। কিন্তু সংসদে আমাদের জায়গাটা কম।

আমি বলার চেষ্টা করি যে, আসলে আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছি এলএনজির জন্য। এক্ষেত্রে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই, আশির দশকে আমরা এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় ছিলেন। তখন আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল ছিলো। আমরা তখন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেলের উন্নয়নের কথা বলেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন নীতিমালাতে রাস্তা তৈরি করা হয়। রেলটাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেয়া হয়। কেন, এখানে মূলত জাপানি লবিং কাজ করেছিলো। বিশেষ করে হিনো বাস কোম্পানি থেকে শুরু করে তাদের পক্ষ থেকে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট করেছিলো আমাদের রাস্তা তৈরি করার জন্য। রাস্তা

> **'সঠিক নীতি গ্রহণ করলে গ্যাসের জন্য এখনই আমাদের বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। হয়তো এটা একটা সময় হবে, একেবারেই হবে না তা নয়, তবে এখনই তা হওয়ার কথা ছিলো না। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের গ্যাস এখনো বেশ ভালো পরিমাণেই রয়েছে। এটা থাকতে কেন আমরা এতটা বিদেশ থেকে আমদানি করবো। কিন্তু আমরা দেখছি, শুধু গ্যাস না, আমাদের পুরো জ্বালানি খাতই শতভাগ আমদানির দিকে চলে যাচ্ছে। এটার বিকল্প ছিলো নিজেরা গ্যাস উত্তোলন করা। গ্যাস অনুসন্ধানের দুর্বলতাই হলো জ্বালানি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা'**
>
> **ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম**
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধ্যান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

তৈরি হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু আমাদের রেল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখনও সেই একইভাবে এলএনজি আমদানি করার জন্য যে প্রস্তাব এলো এবং এলএনজি তারা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। ফলে এলএনজি আমদানি হচ্ছে কিন্তু তার দায়ভারটা জনগণের ঘাড়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের গ্যাসক্ষেত্রগুলো ডেভেলপ করার কথা ছিলো, সেগুলো ডেভেলপ হলো না।

আপনাদের যদি মনে থাকে, আমরা যখন সাগরের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করলাম, তখন আমাদের দেশে বড় উৎসব হয়েছিলো যে, আমরা একটা সমুদ্র জয় করেছি। সংসদেও এটা রীতিমতো ডিজিটাল কায়দায় উপস্থাপন করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে, এই সমুদ্র সম্পদ দিয়েই আমরা বাংলাদেশকে আরো অধিক উন্নতির জায়গায় নিয়ে যাবো। কিন্তু ১০ বছর বাদে এসে দেখা যাচ্ছে, আমরা গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারলাম না, করলাম না। এখানে বদরুল ইমাম সাহেব উল্লেখ করেছেন, যেখানে ভারত করে নিলো, যেখানে মিয়ানমার আরো অনেক বেশি করে সমুদ্রে কূপ খনন করলো। এবং তারা সেই গ্যাস রপ্তানি পর্যন্ত করলো। যার জন্য রোহিঙ্গাদের ওপর এত বড়ো গণহত্যার পরেও, আমাদের ঘাড়ে রোহিঙ্গাদের চাপিয়ে দেয়ার পরও বিদেশি শক্তিগুলো কেবল তাদের জ্বালানি সম্পদের জন্য সেভাবে তাদের বিরোধিতা করলো না। অথচ এলএনজি লবিং আমাদের সমস্ত নীতি নির্ধারণের কাজ করেছে। যে জন্য আমরা সমুদ্রবক্ষে আমাদের অংশে আমরা কিছুই করতে পারলাম না। এটা কেবল এক্ষেত্রে নয়, আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি রাষ্ট্রক্ষমতা এখন পুরোপুরিভাবে, সামরিক, ব্যবসায়ী ও একশ্রেণীর আমলাদের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছে।

আরেকটা মূল বিষয় হচ্ছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সৌরবিদ্যুৎ। এখানে আলোচনায় উঠে এলো যে, আমাদের হয়তো সৌরশক্তি কিছুটা কম হতে পারে ভারতের থেকে, কিন্তু আমাদের যে সৌরশক্তি রয়েছে তা দিয়েই আমরা নিশ্চিতভাবে এখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে এগিয়ে নিতে পারি। তবে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে ২০১৬ সালে যেখানে ১০ শতাংশ বলা হয়েছিল সেখানে, এখন আবার সেই ২০৪১ সাল পর্যন্ত সেই ১০ শতাংশই রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, এ নিয়ে আমাদের কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। সর্বশেষ যে প্রশ্নটি উঠেছে, জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা যেন কিছুতেই ঋণ গ্রহণের পথে না হাঁটি। আমরা দুর্গত দেশ, স্বল্পোন্নত দেশগুলো যারা এতকাল ধরে পরিবেশ বিনষ্ট করেছে আমাদের পাওনা রয়েছে তাদের কাছে। সেটাই আদায় করতে হবে।

আর আমি যেটা বলবো, দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের জ্বালানি খাতে লুণ্ঠনবৃত্তি বন্ধ হয়নি। এই লুণ্ঠনবৃত্তি গত সরকারের আমলে যেমন ছিলো, খাম্বা থাকে তো উৎপাদন নেই, এই লুণ্ঠনবৃত্তি কোনোভাবে ঠেকানো যায়নি। এখন উৎপাদন আছে কিন্তু খাম্বা নেই, এই জায়গায় চলে এসেছে সেই একই লুণ্ঠনবৃত্তির কারণে। আমরা যদি এসব প্রশ্নে নাগরিক আন্দোলন জোরদার না করতে পারি এবং এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে জনগণকে সমৃদ্ধ করতে না পারি, তাহলে এগুলো করে লাভ নেই। আমরা এটা করেছিলাম এবং করেছিলাম বলেই গ্যাস ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে জিতেছিলাম। রামপালে বিজয়ী হতে পারিনি, সুন্দরবনকে আমরা ধংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি। এ অবস্থায় ক্যাব আজ যে উদ্যোগ নিয়েছে, আমি মনে করি এই উদ্যোগের সঙ্গে যদি রাজনৈতিক আন্দোলনকে সংযুক্ত করা যায় এবং এখানে রাজনীতিবিদরা যদি দলীয় বিভাজন ভুলে গিয়ে দাবিগুলো নিয়ে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে তাহলে আমি বলবো এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া বলেছেন যে রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব। হ্যাঁ, এই দায়িত্ব অনেক কঠিন, আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমাদের সংসদ যে ভূমিকা পালন করার কথা ছিলো, সেই ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সংসদে আগে এসব বিষয়ে যতটুকু স্পেস ছিলো, সেটা এখন আরো অনেক কমে গেছে। আপনার জানেন, আমাদের সংসদে এক ঘণ্টার আলোচনা হলে, তিন মিনিট আলোচনা হয় জনগণের প্রশ্ন নিয়ে, গরিবের প্রশ্ন নিয়ে এর বেশি আলোচনা হয় না। এর বাইরে হয় দলের স্তুতি, নিজের স্তুতি, আর বিরোধী দলের বিষোদ্‌গার, এর বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। এর দায়িত্ব আমাদের রাজনীতিবিদদের নিতে হবে। সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া অবশ্য বলেছেন সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে। আমার কথা হলো, আপাতত যে দাবিগুলো আমাদের করা প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা করি। আমি আশা করি, ক্যাব নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আরো আলোচনা করবে। সামগ্রিকভাবে ক্যাবের যে ১৩ দফা দাবি রয়েছে তার ব্যাপারে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা অবশ্যই এগুলো প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হবো।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, ***সঞ্চালক***

আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য। এ মুহূর্তে আমরা শুরু করবো প্রশ্নোত্তর পর্ব। আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে যে কাউকে উদ্দেশ্য করে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি শুরু করবেন।

হাসান জাভেদ, ***সংবাদকর্মী, এনটিভি***

আমি হাসান জাভেদ। এনটিভিতে কাজ করি। ক্যাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটি বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনা করার জন্য। আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি এবং রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছেন। এ প্রোগ্রামে যারা এসেছেন তারা সবাই সুন্দর কথা বলেছেন। খুবই ভালো লাগলো। আশা করছি আপনারা বাস্তবেও সেটির প্রতিফলন ঘটাবেন সংসদে এবং সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি এ দেশের নাগরিক। আমি

সাংবাদিকতা করি। কিন্তু ১ টাকার জিনিস যখন ৮৩ টাকা দিয়ে কিনতে হয় সেটার প্রভাব কিন্তু আমার ওপরেও পড়ে। আমিও কিন্তু অসুবিধার মধ্যে দিনযাপন করছি। এর ভুক্তভোগী আমরাও হই। এখান থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পাবো? জনাব রাশেদ খান মেনন বললেন, দেশে লুণ্ঠনবৃদ্ধি চলছে। আপনারা তো সরকারি দলের সঙ্গে জোটে আছেন, সংসদে কি এ বিষয়গুলো আপনারা বলতে পারেন? সংসদে কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবেন কতটুকু সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবেন এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, সেটাই আমার জিজ্ঞাসা। রাজনীতিবিদদের একটা উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ আছে কিনা।

রাশেদ খান মেনন, *সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি*

আমি তো আগেই বলেছি সংসদের পরিধি আগের চেয়ে অনেক বেশি সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। এই খোলাখুলিই বলছি। আমরা ১৯৯৫, ১৯৯১ সালের সংসদে যে কথা বলতে পেরেছি, ২০০৮ সালে ২০১৪ সালেও যে কথাগুলো বলতে পেরেছি, আজকে সেটা বলা যায় না। বলার জায়গাটা ক্রমাগত কমে গেছে। যেমন ধরেন আমরা রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে সংসদে আলোচনা করেছি, কিন্তু তীব্র প্রতিক্রিয়া সকলের তরফ থেকে পেয়েছিলাম। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সংসদের মধ্যে। তবু আমি মনে করি সংসদে এ বিষয়গুলো তুলে আনা সম্ভব এবং এটা যদি সরকারি দলেরও হয়ে থাকি এবং আমরা যারা জোটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, আমি মনে করি এটা সম্ভব। আমরা করার চেষ্টা করে থাকি এবং আমরা করছি। যেমন এ ইনডেমনিটি আইন নিয়ে আমি নিজেই খুবই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু এটা রদ করার জন্য যেটা প্রয়োজন হবে, সেই সংখ্যাধিক্য তো আমাদের নেই। তবু সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর চাপ তৈরি করা যায়, যদি মিডিয়া সে জায়গাটা তুলে ধরে এবং অনেক বেশি জনমত সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করে। ধন্যবাদ।

রুহিন হোসেন প্রিন্স, *সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)*

রাজনীতিবিদদের উন্নয়নের জায়গা অবশ্যই আছে। তবে আমি সবার উদ্দেশে একটি কথা বলতে চাই। আপনি তেঁতুল গাছে মিষ্টি আম কিভাবে প্রত্যাশা করেন। একটা রাজনৈতিক দল একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। এটা মনে রেখে আপনি তাদের প্রতি প্রত্যাশা করেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমাদের কথা হলো, আমরা জনগণের উপর প্রত্যাশা রেখে এগোতে চাই। এটা মেনন ভাইও বলেছেন শেষ দিকে এসে। এই আন্দোলনকে যদি আমরা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে পারি, তাহলেই হবে। ধন্যবাদ।

মাকসুদ মোরশেদ, *সংবাদকর্মী, যমুনা টিভি*

আমার নাম মাকসুদ মোরশেদ। আমি যমুনা টিভিতে কাজ করি। আমি জানতে চাই, ইনডেমনিটি আইন নিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা? সাংবিধানিকভাবে এটা সম্ভব কিনা? আরেকটা বিষয় হলো, এই ১ টাকা বনাম ৮৩ টাকার হিসাবটা কোথা থেকে এসেছে, এটা যদি ব্যাখ্যা করতেন?

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া
আইন উপদেষ্টা, ক্যাব

ইনডেমনিটি আইনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়া যায়। ইনডেমনিটি আদালতের মাধ্যমে বাতিল করার নজির আছে। আপনাদের হয়তো স্মরণে থাকবে অপারেশন ক্লিনহার্টের ইনডেমনিটি দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে এটা আদালত বাতিল করেছিলো। এটা একটা বড় নজির যে, ইনডেমনিটি থাকলেই যে এটা বাতিল করা যাবে না তা নয়। বুঝতেই পারছেন

> ‘ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে বাইরে থেকে লোক ধরে ধরে এনেছে, তাদের অভিজ্ঞতা আছে কি নাই তা দেখেনি। তাদের দিতে দিতে অনেক বেশি খরচ হয়ে গেলো এবং সরকারের বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। সরকার তখন যা করেছে সব অ্যাড-হক ভিত্তিতে। দীর্ঘমেয়াদি জায়গা থেকে ভাবেনি। গ্যাস যদি না আসে, ডিজেল যদি না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে, এ জিনিসগুলো কিন্তু সরকারের পলিসি মেকাররা চিন্তা করেনি। তারা চিন্তা করেছে রাতারাতি ধুন্ধুমার করে ফেলতে। আমাদের দেশে অনেকেই এনার্জি বিক্রির টাকায় রাতারাতি ধনী হয়ে গিয়েছে। তারা জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে সংকটের সময় বিদেশ থেকে গ্যাস নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ সেই গ্যাস পায়নি। গ্যাস যে জাহাজের মাধ্যমে এসেছে তার পাইপের মাপ আমাদের যে জাহাজে খালাস করা হবে তার পাইপের সঙ্গে মেলেনি। যার ফলে এভাবে যা হয়েছে, তা হলো লুটপাট ’
>
> **দিলীপ বড়ুয়া,** *সাবেক শিল্পমন্ত্রী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল*

এখানে একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত। ফলে এ জায়গায় আমি এর চেয়ে বেশি পরিষ্কার করে বলছি না। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ক্যাব

২০২২ সালে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে যে গণশুনানি হয়, সেখানে পক্ষগুলোর দেয়া তথ্যে এটা জানা যায়। আমরা সেই গণশুনানির রেফারেন্সটাই ব্যবহার করেছি।

জনৈক সংবাদকর্মী, *নাম বলেননি*

আমি একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, ঈদের ছুটির মধ্যে আমরা দেখেছি, গ্যাসের চাপ বেড়ে গেছে এবং পুরো ঢাকা শহরে গ্যাস সঞ্চালন লাইনে নব্বই হাজারের মতো লিক হয়ে গিয়েছে। এই সঙ্কট সমাধানের জন্য ক্যাবের কাছে একটা প্রস্তাব আশা করছি। নিরাপদ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় কি?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ক্যাব

পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহ মূলত কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের শিকার। এলপিজি ব্যবসা প্রমোট করার জন্যই পাইপলাইনের গ্যাস সরবরাহকে প্রতিহত করা হচ্ছে এবং এখানে নানা সংকট দেখা যাচ্ছে। এটাও সরকার নীতিগত অবস্থানের প্রশ্ন।

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

আপনার প্রশ্নটা খুব মূল্যবান। কথা হলো, যথাযথ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা এখনো কেন নেই? উপাদন, বিতরণ সবখানেই এ ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। তিতাসে আমরা কখনোই চারশো, সাড়ে চারশো মিলিয়নের উপরে উঠতে পারি না, অথচ তার পাশেই ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিবিয়ানায় বিদেশি কোম্পানি প্রতিদিন হাজার মিলিয়নের বেশি ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করতে পারে। আমরা যদি তিতাসের উৎপাদনকে ওই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের বহু সমস্যা মিটে যেতো। আমাদের গ্যাস খাত অনেক বড়, টাকাও সমস্যা না, বিভিন্ন তহবিলে টাকা আছে। তবু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা কখনো বিগিনার স্টেপ ছাড়িয়ে অন্য স্টেপে যাইনি।

পরিবেশবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের অন্য একটা জায়গা ছিলো। নিরাপদ গ্যাস নের্টওয়াক আমাদের নগরবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা ঈদের সময় অনুভূত হয়েছে। আমি আজকে স্পষ্ট করে ক্যাবের পক্ষ থেকে বলবো, যখন হঠাৎ করে কোনো অতিরিক্ত চাপে এ জিনিসগুলো প্রতিভাত হয় তখন আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। এখনই আমাদের পদক্ষেপ নেওয়ার সময়। এটা অবজ্ঞা করার সময় না এবং আমরা দাবি করছি নয় হাজার কিলোমিটারের যে লাইন রয়েছে তিতাস গ্যাসের, তার মাত্র দেড় হাজার কিলোমিটার পরীক্ষা করেই অনেক ছিদ্র বা এ ধরনের লিকেজ পেয়েছে। এটা ভয়াবহ ব্যাপার। ভূমিকম্পসহ অনান্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে গ্যাস সরবরাহ লাইন নিরাপদ ও আধুনিকায়ন করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে এটা করার উদ্যোগ তিতাস গ্যাসের নেওয়া দরকার।

আজাদ আবুল কালাম
সদস্য, প্রাণ প্রকৃতি সুরক্ষা মঞ্চ

ক্যাবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা ১৩ দফা দাবি জানিয়েছে। একটা জায়গা আমরা কাছে মনে হয়েছে এখানে আসেনি, তা হলো এনার্জি চার্টার ট্রিটি। যেখানে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। এটা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি। এ চুক্তিতে বাংলাদেশ যদি যুক্ত হয় তাহলে আমাদের এনার্জি সেক্টর আরো বেশি ভালনারেবল অবস্থার দিকে যাবে। আমরা কর্পোরেটের কাছে আরো দায়বদ্ধ হয়ে পড়বো। আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এ বিষয়ের কোনো আলোচনা আমি ১৩ দফার মধ্যে দেখলাম না। এর পাশাপাশি হয়তো জ্বালানি বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি আরো কিছু আছে। সেগুলো সম্পর্কেও বক্তব্য, অবস্থান থাকা দরকার।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ক্যাব

হ্যাঁ, এটা যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল, এটা আমরা অবশ্যই করবো।

হাফিজুর রহমান, *ভোক্তা অধিকার আন্দেলনের কর্মী*

আমি রাষ্ট্রের একজন নাগরিক। আমি ক্যাবকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে এবং তাতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যুক্ত করেছেন। সামনে তো নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ইশতেহার হবে তাতে এই ইস্যুটা গুরুত্ব পাবে কিনা। ধন্যবাদ।

রাশেদ খান মেনন, *সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি*

আমাদের অতীতের রাজনৈতিক ইশতেহার যদি দেখেন এমনকি আমাদের ১৪ দলের রাজনৈতিক যে অবস্থান তাতেও নীতিগত ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো আছে, সুস্পষ্টভাবে না থাকলেও। এটা আমরা করবো। আমি আমার রাজনৈতিক দলের কথা বলতে পারি। তবে আমাদের নির্বাচন কিন্তু পলিসিভিত্তিক হয় না। আমরা ইশতেহার দেই। কিন্তু নিবার্চন হয় প্রতীকভিত্তিক। প্রতীকভিত্তিক ভোট ভাগ হয়ে যায়। নির্বাচনের ইশতেহার বিবেচনার মধ্যে আসে না। তবু আপনি যেভাবে বলেছেন আশা করবো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা যারা এখানে এসেছেন তারা করবেন। ধন্যবাদ।

লুৎফর রহমান কাকন, *সংবাদকর্মী, আমাদের সময়*

এখানে অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা হয়েছে দেশের স্বার্থে এবং অনেক ইস্যু এসেছে। জ্বালানি বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। আমরা দেখি যারা জ্বালানি খাতের সরকারি সংস্থাগুলোর

দায়িত্বে থাকে, দায়িত্ব পালন শেষ করেই তারা এই খাতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাতে করে তারা যখন দায়িত্বে থাকেন তখন দেশের স্বার্থে কাজ করতে পারেন কিনা, নাকি তার ভবিষৎ নিশ্চিত করার জন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট কোম্পানিকে সুবিধা দিয়ে যান। এ ইস্যুতে ক্যাব কাজ করবে কিনা? দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পরে জ্বালানি খাত থেকে তাদের সুবিধা লাভের পথ বন্ধ করা যায় কিনা? সবাইকে ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া
আইন উপদেষ্টা, ক্যাব

চমৎকার একটা প্রশ্ন। আমরা নিজেরাও একটা সিরিয়াস ডিলেমার মধ্যে আছি এ বিষয় নিয়ে। আপনি যা বললেন, এটা একটা প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেয়ার মতো। এ নিয়ে বলতে গেলে কথা শেষ হবে না। আপনারা যদি ওয়েবসাইটগুলো চেক করেন, দেখবেন যিনি জ্বালানি সচিব, তিনিই আবার লাভজনক সংস্থার পদে আছেন। এটা কিভাবে সম্ভব। এই কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের প্রশ্নটায় হাত দিলে আমলাতন্ত্রের অনেকেই বিপদে পড়বেন। শুধু অবসরের পরে না, চাকরিতে থাকা অবস্থায়ও তারা এ কাজগুলো করেছেন। নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়গুলো বুঝেন বলে আমার মনে হয় না। ফলে এটা একটা বড় হতাশার জায়গা।

> **আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, স্বনির্ভর বাংলাদেশ তৈরি করতে। এখন আমরা স্বনির্ভর শব্দটা ভুলে গিয়েছি। যেকোনো কিছুর জন্য আমরা বিদেশিদের দ্বারস্থ হচ্ছি। পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্ত রয়েছে, তাকে যারা পদদলিত করে, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে তাদের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেটা যারা উপেক্ষা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ, প্রতিউচ্চারণ জারি রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্য পরিবেশ অধিকার ও জলবায়ু সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বাধ্য। এটা আমাদের অঙ্গিকার, এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সাংবিধানিকভাবে এটা আমাদের দায়ও বটে। এ দায় প্রতিপালন করতে হবে**
>
> **স্থপতি ইকবাল হাবিব**
> *সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব*

আনিস রায়হান, *জ্বালানি খাত গবেষক*

জ্বালানি একটি বিশেষায়িত খাত। এ খাতের বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকরা অনেক সময় এ আলাপ আলোচনার ফোকাস পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে না। এ বিষয়গুলো বেশ জটিল যেহেতু, অনেকে এগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না। ফলে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত করার কোনো সুযোগ আছে কিনা। আর জ্বালানি খাতে একই বিষয়ে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। সরকারের একেক সংস্থা একেক রকম তথ্য দেয়, এর মধ্যে কোনটা নিয়ে কাজ করতে হবে তা নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। এক্ষেত্রে সঠিক ও সর্বাধুনিক তথ্যগুলোর সমন্বয়ে এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের একটি সংকলন প্রকাশ করা যায় কিনা। ক্যাব এটা ভেবে দেখতে পারে। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, ক্যাব

আমি গত বছর চেষ্টা করেছিলাম। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপও করেছিলাম। কিছু কাজ আমাদের সঙ্গে করার জন্য। কিন্তু তারা করতে পারেননি। সাংবাদিকদের এক্ষেত্রে সহায়তা করতে আমরা আগ্রহী। আর একটা ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য প্রস্তাব সরকারের কাছে অনেক আগেই দেয়া হয়েছে। তারাই সব কিছু বানিয়ে দেবে। আমাদের টাকা দেওয়া লাগবে না। এটা পরিকল্পনা কমিটিতে গিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এটার অনুমোদন দিতে দিতে এক থেকে দেড় বছর লেগে গেছে। পরে অনেক তদবিরের পর আরো খানিকটা অগ্রগতি ঘটেছে। সুতরাং আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে এ জিনিসটা আমাদের উদ্যোগের মধ্যে আছে। আশা করছি কিছু না কিছু হবে।

রবিন, সংবাদকর্মী, সময় টেলিভিশন
আমার প্রশ্ন শামসুল আলম স্যারের কাছে। আইএমএফের ঋণের শর্ত অনুযায়ী ভর্তুকি প্রত্যাহারের অযুহাতে গত তিন মাসে আমরা দেখেছি বিদ্যুতের দাম প্রতি মাসে বেড়েছে। গ্যাসের দামও বাড়ানো হলা। আইএমএফের ঋণ কি ভূমিকা রাখছে, এ বিষয়টা জানতে চাচ্ছি।

মাহফুজুর রহমান মিশু
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, যমুনা টেলিভিশন

আমি আরেকটু যুক্ত করি। গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা সব বিষয়ে তিতাসকে দায়ী করি।

কিন্তু গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি জিটিসিএলের এখানে কী ভূমিকা থাকা দরকার ছিলো?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, ক্যাব

আজকে যেহেতু পলিসি লেভেলের কথাবার্তা নিয়ে এসেছি। তাই মাইক্রো লেভেলের বিষয়াদিতে কথা বলে জটিলতা বাড়াতে চাইনি। আইএমএফের শর্তে কোথাও বলা নেই যে, দাম বাড়াতে হবে। তারা বলেছে, ঘাটতি কমাতে হবে। আমরা বলেছি অযৌক্তিক ব্যয় বন্ধ করা গেলে যে অর্থ সাশ্রয় করা যাবে, তা দিয়েই ঘাটতি কমানো যায়। এটা গ্যাস খাতে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা, আর বিদ্যুতে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু একটি টাকাও ব্যয় কমানোর উদ্যোগ তারা নেয়নি। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি করে জনগণের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

গ্যাস লিকেজ বন্ধ করতে হবে সে কথা ইকবাল হাবিব বলেছেন। আমরা ঢাকা শহরের মানুষ গ্যাস মিশ্রিত দূষিত বায়ুর মধ্যে বসবাস করছি। এটাকে আমার রিকগনাইজ করি না, সরকার, রাষ্ট্র রিকগনাইজ করে না। এটা থ্রেট টু লাইফ। বিস্ফোরণ ঘটছে, কারো কিন্তু মাথাব্যথা নেই। সংসদ সদস্যরা আছেন, আমরা চাইবো, এ বিষয়গুলো তারা সংসদে তুলবেন এবং সরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্যোগ নেবেন।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

অনেক ধন্যবাদ স্যার। এখন আমরা আজকের সভার সভাপতি, ক্যাবের সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করবো সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য।

গোলাম রহমান, *সভাপতি, ক্যাব*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের আলোচনায় মুখ্য আলোচক, বিশেষ আলোচক, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, গণ্যমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ।

আজকের এ সভায় 'জ্বালানি সংকট ও নবয়ানযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন' শীর্ষক ক্যাবের সংস্কার প্রস্তাব ও ১৩ দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়েছে। এ আলোচনার প্রথমে আমি স্মরণ করতে চাই স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন ভাইকে। তার অনুপস্থিতিতে আমরা আজ এ প্রোগ্রাম করছি। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন।

একটি কথা আমি বলতে চাই, ক্যাব একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ক্যাব মানুষের কথা বলে, ক্যাব মানুষের মঙ্গলের কথা বলে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে। এ কার্যক্রম আমরা অতীতে করেছি, বর্তমানে করছি, ভবিষ্যতেও করবো। তবে মানুষের কল্যাণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে রাজনৈতিক কর্মীরা। কারণ তারাই দেশ পরিচালনা করেন। তাই রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কাছে আমাদের প্রত্যাশা তারা ক্যাবের অরাজনৈতিক, মানব কল্যাণমুখী প্রস্তাব ও কর্মকাণ্ডে জোর সমর্থন দেবেন। এবং আমাদের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

জ্বালানি খাতে যা চলছে, তাতে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে পাই না। সারা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ব্যাপার ঘটছে, তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমাদের শরীরে রক্ত যে ভূমিকা পালন করে, দেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ একই ভূমিকা রাখে। আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে, বিগত এক দশকে দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন অনেক হয়েছে। তবে একইসঙ্গে আমরা চাই মানসম্মত জ্বালানি, নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং সহনশীল সাশ্রয়ী দাম। সেটা সরকার কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছে সেক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। আমাদের ধারণা সরকার অনেক কিছুই শুরু করেছে, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারেনি। একসময় ডিজেল পোড়া গন্ধে রাস্তাঘাটে চলা যেতো না, বাসায় থাকো যেতো না। সে অবস্থা থেকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি এবং অপচয়, অনিয়ন্ত্রিত ব্যয়, এগুলো আমাদের বেড়ে গিয়েছে।

আমাদের আলোচনায় যে বিষয়টি খুব জোরালোভাবে এসেছে, সরবরাহ বাড়ছে ৭ শতাংশ, আর উৎপাদন বেড়েছে ১২ শতাংশ। অর্থাৎ উৎপাদন বসে থাকছে। এর মধ্যে আবার উৎপাদন বাড়াতে আদানির থেকে আমদানি করছে। যদি কারো ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণের উপর এই ব্যয়ের বোঝা চাপাতে চায়, তাহলে তাদের জবাবদিহি জরুরি। আরেকটা কথা, সরকার সারাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এটা খুব ভালো কথা। এর জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এটা কি বাণিজ্যিক কর্মসূচি? এটা তো বাণিজ্যিক কর্মসূচি হতে পারে না। বিদ্যুৎ খাতে কস্ট সাবসিডি আছে। যারা বেশি ব্যবহার করে তারা বেশি মূল্য দেয় আর যারা খুব দরিদ্র মানুষ, একেবারেই সীমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাদের জন্য বোধহয় লাইফলাইন ট্যারিফ রয়েছে। সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে। সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য যে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যয় সব ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? সব ভর্তুকি ব্যবহারকারীদেরই দিতে হবে, এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? এই বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের ভেবে দেখা উচিত। যদি ব্যয় হয়ে থাকে, সেটা কেন হচ্ছে? খুঁজে দেখা উচিত।

১ টাকা বনাম ৮৩ টাকা, গ্যাসের মূল্যের এ আলাপটা বারবার এসেছে। এখানে বোধহয় স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন। সরকারের যেসব গ্যাস উৎপাদনকারী সংস্থা আছে তাদের থেকে ক্রয় করা হলে ১ টাকা কয়েক পয়সা খরচ পড়ে। যখন বিদেশি উৎপাদনকারীর কাছে গ্যাস ক্রয় করা হয় তখন কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর যখন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তখনও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দাম হচ্ছে। যদি কাতার, কুয়েত অথবা অন্যান্য দেশ থেকে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় আমদানি করা হয় তাহলে একরকম দাম আর স্পট মার্কেট থেকে কিনলে একেক সময় একেক রকম দাম। আমরা যখন ১/৮৩ বলছি, এটার একটা ভিত্তি আছে। আমাদের সংস্কার প্রস্তাবের ৬ নম্বর পয়েন্টে এর উল্লেখ আছে।

আর বলবো, নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই।

এখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের প্রসঙ্গটাও রয়েছে। জার্মানি তাদের ৩টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ রেখেছে। যদিও দেশটি জালানি সংকটে আছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, ষাটের দশকে তখন রূপপুরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট হওয়ার প্লান চলছিলো। এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। কথা হচ্ছে, আমরা কি রূপপুরেই থেমে যাবো নাকি আরো দুই একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করার উদ্যোগ নেবো। আমার ধারণা, আরো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট করাটা বোধহয় সঠিক হবেনা। কারণ বিশ্বজুড়েই এখন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট যেসব দেশে আছে তারাই এটা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের নতুন করে এটা সৃষ্টি করা ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না।

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় সৌরশক্তি দিয়ে, পানি দিয়ে, গ্যাস দিয়ে, জ্বালানি তেল দিয়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় নিউক্লিয়ারের মাধ্যমে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কয়লা দিয়ে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই বন্ধ করে দিচ্ছে, পরিবেশগত কারণে। কিন্তু আমাদের দেশে বেশ বড়সড়ো করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই উদ্যোগটার কিছুটা বোধহয় স্থিমিত হয়েছে এখন। কিন্তু একেবারে থেমে নেই। ক্যাব মনে করে মধ্যমেয়াদি বা স্বল্পমেয়াদি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সীমিত পর্যায়ে হতে পারে। তবে এই যে স্বল্পমেয়াদে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, সেখানে কয়লা আমদানি করা হচ্ছে। আমাদের দেশে কিন্তু কয়লার পর্যাপ্ত মজুদ আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কিন্তু সে কয়লা আমরা উত্তোলন করছি না, আমদানি করছি বিদেশ থেকে। আজকেও বোধহয় দেখলাম রামপালে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে আছে। কারণ কয়লা নেই। এই যে বিদেশ নির্ভরতা, এটা কেন? আমাদের আলোচনায় উঠে এসছে দেশের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে আমদানির প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি উল্লেখ করতে চাই, তা হলো, আমাদের যে নীতি নির্ধারকরা, তাদের সব বিষয়ে স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

যে আইনটির কথা বারবার এসেছে, ইনডেমনিটি আইন। এই আইনের অধীনে যে নেগোসিয়েশন করে কাজ দিচ্ছে, সেই নেগোসিয়েশন শেষ করার পরে সম্পূর্ণ বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেয়া উচিত। এবং আহ্বান করা যায় কেউ এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব দিতে পারে কিনা। যদি বেটার অফার দিতে পারে তাহলে যার সঙ্গে নেগোশিয়েট করা হয়েছে তাকে বলা হয় তুমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি কিনা, যদি রাজি হও তাহলে তোমার আর যদি রাজি না হও তাহলে যিনি কাউন্টার অফার দিয়েছে বা বেটার অফার দিয়েছে, আমরা তাকে কাজ দেবো। ইনডেমনিটি থাকা উচিত না। তবে এটা যেহেতু আছে, এ ধরনের একটা পজিশন সেখানে সংযুক্ত করা যায় কিনা আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা দেখবেন।

আর এই যে জ্বালানি তেলের দাম, আমেরিকাতে দেখেছি যে সকাল বিকাল গ্যাস স্টেশনে পেট্রোল পাম্পে দাম বাড়ে কমে। আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে এইটা কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য সেটা বোধহয় ভেবে দেখার অবকাশ আছে। ক্যাব থেকে আমরা দীর্ঘদিন বলে আসছি যে, দাম যদি একটা নির্ধারিত হয়, তারপর যদি আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে যায়, তাহলে ওই দাম থেকে যেটা বাড়তি আয় হবে সেটা একটা তহবিলে রাখা হবে। দাম যখন আবার বাড়বে তখন ওই তহবিল ব্যবহার করা হবে। এতে একদিকে মূল্য স্থিতি যেমন থাকবে আর একদিকে ভর্তুকি থেকেও বোধহয় আমরা পরিত্রাণ পেতে পারবো। এই যে এলপিজির দাম আমাদের দেশে বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে, এর সুফল কতটুকু আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যখন বাড়ে তখন বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু যখন কমে তখন এটার প্রয়োগ ঘটে না। অনেক কথা বললাম, অনেক সময় পার হয়ে গেছে, আপনারা যারা অনুগ্রহ করে আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আলোচনা শেষ করছি।

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, *সঞ্চালক*

অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি

> **‘ সরকারের এখন যে ভূমিকা, সেটা হচ্ছে রেগুলেটর প্লাস বিজনেসম্যান। এ জায়গা থেকেও কিন্তু বের হয়ে আসতে হবে। সরকার রেগুলেটরের জায়গায় ভূমিকা পালন করবে, আবার সে জায়গায় থেকে বিজনেসও করবে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান খুলে, এটা স্বার্থসংঘাতপূর্ণ। এই যে জনগণের অর্থ নিয়ে ২৫টি ব্যাংকে লগ্নি করছে পেট্রোবাংলা। অথচ এই তহবিল করা হয়েছিল জনগণের টাকা নিয়েই। কথা ছিল এটা জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে ব্যবহার করা হবে। অথচ সেই টাকা ব্যাংকে রাখছেন, জনগণ তা নিয়ে আবার সুদ দিচ্ছে। জনগণের দেয়া টাকা থেকে আবার মুনাফা করছেন জনগণকে দিয়েই। এটা তো আইনসম্মত হলো না। ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। এগুলো অবশ্যই বন্ধ করতে হবে ’**
>
> **ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া,** *আইন উপদেষ্টা, ক্যাব*

মহাদয়কে। আমরা এখন অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে। এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মধ্যাহ্নভোজের জন্যে আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ করছি ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবীর ভূঁইয়াকে।

এডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া, *সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব*

ক্যাব কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই নাগরিক সভার সম্মানিত সভাপতি, ক্যাবের সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় জনাব গোলাম রহমান স্যারসহ সম্মানিত মুখ্য আলোচক ও আলোচকবৃন্দ এবং সংবদকর্মীসহ আর যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের কার্যক্রম এখানেই শেষ করছি।

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
প্রকৌশলী শুভ কিবরিয়া
গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মেকআপ
মো: মনসুর আলম
শ্রুতিলিখন ও সম্পাদনা
চিন্তন
৬৮, দ্বিতীয় তলা, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫

আলোচকবৃন্দ

[আলোচনার ক্রমানুসারে]

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, ক্যাব

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

স্থপতি ইকবাল হাবিব
সদস্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশন, ক্যাব

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া
আইন উপদেষ্টা, ক্যাব

জনাব রাজেকুজ্জামান রতন
সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

জনাব দিলীপ বড়ুয়া
সাবেক শিল্পমন্ত্রী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী
সংসদ সদস্য

রাশেদ খান মেনন, সংসদ সদস্য
সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

হাসান জাভেদ
সংবাদকর্মী, এনটিভি

মাকসুদ মোরশেদ
সংবাদকর্মী, যমুনা টিভি

আজাদ আবুল কালাম
সদস্য, প্রাণ প্রকৃতি সুরক্ষা মঞ্চ

হাফিজুর রহমান
ভোক্তা অধিকার আন্দেলনের কর্মী

লুৎফর রহমান কাকন
সংবাদকর্মী, আমাদের সময়

আনিস রায়হান
জ্বালানি খাত গবেষক

রবিন
সংবাদকর্মী, সময় টেলিভিশন

মাহফুজুর রহমান মিশু
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, যমুনা টেলিভিশন

গোলাম রহমান
সভাপতি, ক্যাব

এডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব

ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, সঞ্চালক

সহযোগিতায় : **ভোক্তাকণ্ঠ**